KUinEu
Khulna University Graduates in Europe

তৃতীয় সংখ্যা

শেকড়ের টানে

For the Roots

অমর একুশে

INTERNATIONAL
MOTHER LANGUAGE DAY

আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস ২০২৬

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

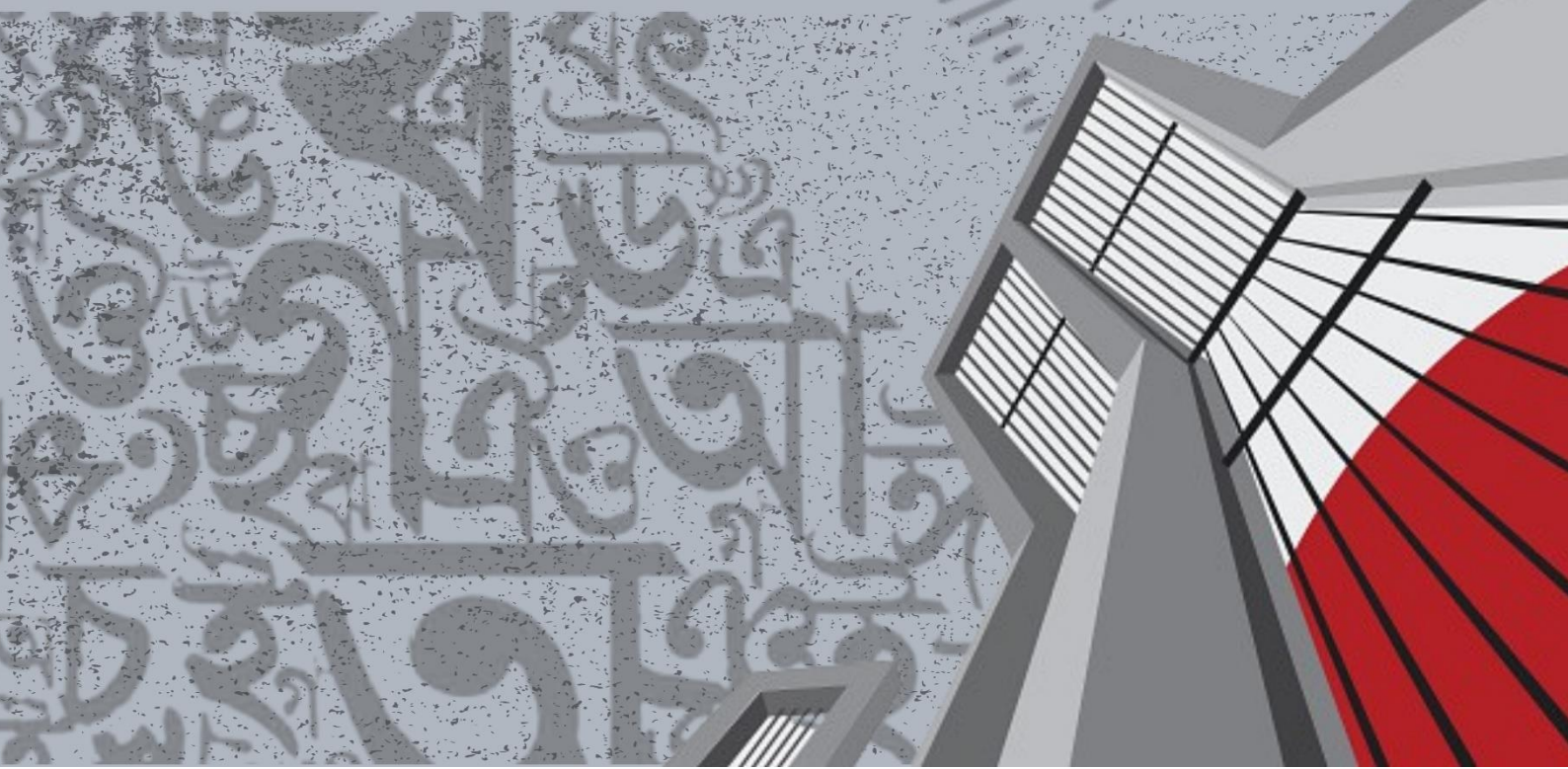

সূচিপত্র

- শেকড়ের টানে
- আ-মরি বাংলা ভাষা
- আমার একুশের স্মৃতি:
- কথার কথা - ভাষার বেড়ে ওঠা
- অক্ষরের পুনর্জন্ম: বিজয়, অভ্র ও বাংলা ভাষার ডিজিটাল যাত্রা
- আমার শহরে। একজীবনে। আমাদের সময়
- আমার দুরন্ত সেনারা
- Train to Samarkand/ ট্রেইন টু সমরকন্দ
- নীল বসফরাস থেকে শ্বেতশুভ্র বেলজিয়াম: এক স্বপ্নযাত্রার রোজনামচা
- ডোপামিন রাশ আর অদেখা সৌন্দর্যের টানে অপ্রত্যাশিত গন্তব্যে
- মোটাদাগের কথা
- কেপ টাউনের দিনলিপি
- আমাদের মহল্লা
- বিদায় প্রেয়সী
- শিশু ওম। নিঘুমে ডিঙি নৌকা। অব-দংশ
- জার্মানির তিন বাঙালি বীর
- আমি ও আমার বাংলাদেশ
- স্রোতের সাথে চলা জীবন
- পুনর্মিলনী সমাচার: ব্ল্যাক ফরেস্টে ঝটিকা রিইউনিয়ন
- উত্তরের উত্তরে: একটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনমেলার গল্প

প্রচ্ছদ অঙ্কন, পরিকল্পনা এবং সম্পাদনায়

তৌহিদ আমানুল্লাহ, স্থাপত্য'৯১/স্টকহোম, সুইডেন
বিশ্বজিৎ মল্লিক (শুভ), নগ্রাপ'৯৪/ড্রেসডেন, জার্মানি
আবু সাঈদ রবিন, বিবিএ'৯৪/কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক
খুরশীদ হাসান সজীব, নগ্রাপ'৯৯/বন, জার্মানি
মিঠুন কুমার সমাদ্দার, এটি'০৫/রাটিংগেন, জার্মানি
মনিরুল ইসলাম, এটি'০৬/ ঘেন্ট, বেলজিয়াম
জাকিয়া সুলতানা, ইএস'০৯/উট্রেখট, নেদারল্যান্ডস
জামিল শুভ, বিজিই'১৪/ব্রেমারহাফেন, জার্মানি
আহম্মেদ বিন আব্দুস সালাম, এসডব্লিউই'১৪/বন, জার্মানি

স্বত্বাধিকারী
KUinEu

শেকড়ের টানে

তিনটি বছর সময়ের হিসাবে খুব বড় নয়, কিন্তু প্রবাস জীবনের ব্যস্ততা, সংগ্রাম আর স্বপ্নের ভেতর দিয়ে পথ চলতে চলতে এই সময়টুকু আমাদের অনেক অভিজ্ঞতার সাক্ষী করেছে। আজ আবার একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত আলোয় আমরা ফিরে এলাম আমাদের প্রিয় প্রকাশনা "শেকড়ের টানে"-এর তৃতীয় সংখ্যা নিয়ে। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন KuinEu - এর পক্ষ থেকে আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের সকল শহীদদের। ১৯৫২ সালের সেই রক্তঝরা ফেব্রুয়ারি কেবল একটি তারিখ নয় এটি আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ঘোষণা। **"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"** আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী-এর অমর পংক্তি এবং আলতাফ মাহমুদ-এর হৃদয়স্পর্শী সুর আজও আমাদের শিরায় শিরায় স্পন্দিত হয়। তেমনি আব্দুল লতিফ-এর **"ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়"** শুধু একটি গান নয়, এটি এক অবিনাশী প্রতিবাদের ভাষা।

এই সংখ্যাটি প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের বারবার মনে পড়েছে তাঁদের কথা, যাঁদের হাত ধরে "শেকড়ের টানে"- এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রবাসের মাটিতে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার যে স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন, আজ তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এগিয়ে চলেছি। তাঁদের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে, রাত জেগে বাংলা লেখা সম্পাদনা করা, বানান নিয়ে তর্ক করা, প্রচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করা এসবের ভেতর যে উত্তেজনা, যে আবেগ, তা কেবল প্রবাসী হৃদয়ই বোঝে। ব্যস্ত কর্মজীবনের ফাঁকে মাতৃভাষার জন্য সময় বের করে নেওয়া মানে নিজের শেকড়কে আঁকড়ে ধরা। সেই টানই আমাদের বারবার একত্র করে। আমরা চাই "শেকড়ের টানে" হয়ে উঠুক ইউরোপে বসবাসকারী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের মুখপত্র। চিন্তার, সৃজনের, স্মৃতির এবং দায়বদ্ধতার একটি সম্মিলিত অঙ্গন। নতুন প্রজন্মের লেখনী এখানে যেমন জায়গা পাবে, তেমনি প্রবাস জীবনের না বলা গল্প, আত্মপরিচয়ের খোঁজ, এবং দেশের প্রতি অবিচল ভালোবাসার প্রকাশও জায়গা করে নেবে।

একুশ আমাদের শিখিয়েছে মাথা নত না করতে। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয় এটি আত্মার আশ্রয়। তাই এই প্রকাশনা কেবল একটি পত্রিকা নয়, এটি আমাদের সম্মিলিত আবেগের প্রতিধ্বনি। আমাদের এ প্রয়াসে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি মার্জনীয় দৃষ্টিতে দেখবেন। সকল ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে "শেকড়ের টানে"- এর তৃতীয় সংখ্যা উৎসর্গ করছি। শেকড়ের টানে হোক আমাদের আত্মপরিচয়ের পুনরাবিষ্কার, হোক KUinEu-এর আবেগ প্রকাশের দৃঢ় মাধ্যম।

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়,
সম্পাদকমণ্ডলী

আ-মরি বাংলা ভাষা

মিঠুন কুমার সমাদ্দার, এটি'০৫

ভাষা মানুষের প্রথম আশ্রয়। মায়ের কোলের উষ্ণতা যেমন, তেমনি প্রথম উচ্চারিত শব্দের স্পন্দনও এক অনন্ত নিরাপত্তা। আমার বাংলা ভাষা সেই আশ্রয়, সেই স্পন্দন, সেই পরিচয়ের মূল। এই ভাষায় আমি প্রথম পৃথিবীকে ডেকেছি, প্রথম কেঁদেছি, প্রথম ভালোবেসেছি। বাংলা ভাষার ইতিহাস বহু শতাব্দীর। প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ থেকে এর উদ্ভব; চর্যাপদের রহস্যময় পদাবলি থেকে শুরু করে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, তারপর আধুনিক যুগে নবজাগরণের জোয়ার বাংলা ভাষা ক্রমে হয়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডার। রবীন্দ্রনাথ এর কাব্যে বাংলা পেয়েছে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা; তাঁর **"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি"** কেবল একটি গান নয়, এক জাতির আত্মঘোষণা। কাজী নজরুল ইসলাম এর বিদ্রোহী উচ্চারণ বাংলা ভাষাকে দিয়েছে প্রতিবাদের আগুন; জীবনানন্দের রূপসী বাংলায় আমরা খুঁজে পাই মাটির গন্ধ, শ্যামল প্রান্তরের চিরন্তন সুর।

কিন্তু বাংলা ভাষার ইতিহাস শুধু সাহিত্যিক বিকাশের ইতিহাস নয়; এটি সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কেবল উর্দুকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা ছিল বাংলা। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ প্রথম প্রতিবাদে মুখর হয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাস্তায় নামে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। ইতিহাসে স্বীকৃত শহীদের সংখ্যা পাঁচজন—আবুল বরকত, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আবদুল জব্বার ও শফিউর রহমান তবে অজ্ঞাত আরও বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়েছিলেন। তাদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রান্তর। এই রক্তদানের ফলেই ১৯৫৬ সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনারও ভিত্তি স্থাপন করে। ভাষা হয়ে ওঠে জাতীয় সত্তার কেন্দ্রবিন্দু।

স্মারক | Jiban K Ray – ECE'01

ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন সাহিত্যে গভীরভাবে উপস্থিত। শহীদদের স্মরণে রচিত হয়েছে অগণিত কবিতা ও গান। **"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"** এই গান আমাদের হৃদয়ে চিরন্তন শোক ও গৌরবের মিশ্র অনুভূতি জাগায়। নাট্যকার মুনির চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত নাটক রক্তাক্ত প্রান্তর-এ ভাষা আন্দোলনের অন্তর্গত টানাপোড়েন, ত্যাগ ও প্রতিবাদের মানসিক দৃশ্যপট ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পে ভাষা আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক ঘটনা নয়; এটি ব্যক্তিগত বেদনা, পারিবারিক শোক ও জাতীয় আত্মমর্যাদার প্রশ্ন হয়ে এসেছে।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ফলে বাংলার একুশ বিশ্বমানবতার প্রতীক হয়ে ওঠে। ভাষার জন্য জীবনদান—এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আজ বিশ্বের নানা প্রান্তে এই দিনটি পালিত হয় মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে।

বাংলা ভাষা তাই কেবল শব্দের সমষ্টি নয়; এটি রক্তে লেখা ইতিহাস। যখন আমরা "আমার সোনার বাংলা" গাই, তখন আমাদের কণ্ঠে শুধু সুর নয়, আছে এক জাতির দীর্ঘ সংগ্রামের স্মৃতি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল অর্পণ করার অর্থ হলো—আমরা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দায় স্বীকার করছি। আ-মরি বাংলা ভাষা—এ আমার পরিচয়, আমার গর্ব, আমার দায়। এই ভাষায় লেখা প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি গান, প্রতিটি প্রবন্ধ শহীদদের রক্তের সঙ্গে সংযুক্ত। বাংলা লিখলেই তাই মনে হয়, আমি শুধু অক্ষর সাজাচ্ছি না; আমি ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখছি।

"**আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি**" এই উচ্চারণে যে আবেগ, তা ব্যক্তিগত নয়; তা সমষ্টিগত। এই ভালোবাসা রক্তে অর্জিত, সংগ্রামে প্রতিষ্ঠিত, আর সাহিত্য-সংস্কৃতিতে চিরস্থায়ী।

অবনী | Bappy – URP'95

আমার একুশের স্মৃতি:

তৌহিদ আমানুল্লাহ, স্থাপত্য'৯১

একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য আমি বুঝতে শিখি খুব ছোটবেলায়, সম্ভবত তখন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। ভোরবেলার সেই দিনগুলোর কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কুয়াশা ভেজা মাঠ, সূর্য তখনো ওঠেনি, শিশিরভেজা ঘাসের ওপর খালি পায়ে হেঁটে আমরা প্রভাতফেরীতে যেতাম। শীতল মাটির স্পর্শে শরীর শিরশির করত, কিন্তু মনে থাকত এক ধরনের গভীর আবেগ।

স্কুলের মাঠে সবাই জড়ো হতাম। পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত, তারপর সেই হৃদয়স্পর্শী গান

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি..."

কেউ একজন গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে গান ধরতেন, শিক্ষকরা সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম।

আমার স্কুলের নাম "বাটাজোর অশ্বিনীকুমার প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়। বাটাজোর হাইস্কুল এর তুখর ছাএ তপন সমাদ্দার দাদা, তার আনবদ্য ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও এর তাৎপর্য নিয়ে কথা বলেছেন; যা আমার ছোট মনে আজ ও দাগ কাটে। সালাম, রফিক, বরকতদের কথা বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে আসত, অনেক সময় তাঁকে কাঁদতেও দেখেছি। সেই দৃশ্য আমাদের ছোট্ট মনেও গভীর দাগ কেটেছিল।

শিক্ষকদের কথাও মনে পড়ে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গোলাম হোসেন স্যার, প্রাইমারি স্কুলের

শিক্ষক মুকুন্দ স্যার, ধর্ম শিক্ষক মাওলানা হাবিবুর রহমান, সদানন্দ স্যার, পন্ডিত স্যার এবং আরও অনেকে। তাঁদের কথায় আমরা শুধু ইতিহাস শুনতাম না, অনুভব করতাম ভাষার জন্য আত্মত্যাগের মূল্য।

অতপর: অ্যাসেম্বলি শেষে শুরু হত প্রভাতফেরী। খালি পায়ে সারিবদ্ধ হয়ে আমরা পুরো বাজার ঘুরে আবার স্কুলে ফিরতাম। পথের ধারে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ, দোকানদার, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সবার অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মনে হত, একুশ শুধু স্কুলের অনুষ্ঠান নয়, সবার হৃদয়ের বিষয়।

দিনভর চলত আলোচনা সভা, রচনা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও সংগীত প্রতিযোগিতা। আমিও প্রতিবার কবিতা আবৃত্তি করে পুরস্কার পেয়েছিলাম। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী শেষে বাড়ি ফিরতাম, কিন্তু মনটা অদ্ভুতভাবে ভারী হয়ে থাকত। মনে হত, এমন করে কেন গুলি বিদ্ধ করলো। আসলে মায়ের ভাষা রক্ষা, মনের ভাব প্রকাশ। এক ধরনের কষ্ট অনুভব করি আজ ও।

পরবর্তী তে বাবা ডাক্তার এ.কে.দেওয়ান। বাটাজোর সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, সবার কাছে দেওয়ান ডাক্তার নামে পরিচিত। প্রভাতফেরীতে আব্বার উপস্থিতি ও আমার ৭ ভাই বোনদের উৎসাহিত করেছেন। বাবার চাকরির স্থান পরিবর্তন হয় বরিশাল সদর-এ ১৯৮৩-তে। অত:পর, বরিশালের অক্সফোর্ড মিশন হাইস্কুলের ২১শে ফেব্রুয়ারির সকল অনুষ্ঠানে ছিলাম সকৃয়। এবং বিকলে যেতাম বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। পরবর্তীতে ১৯৮৮ এ বিএম কলেজে প্রতেক প্রভাভফেরীতে অংশগ্রহণ ও বই মেলায় এবং বিশেষ করে অশ্বিনী কুমার টাউন হলে ২১শের আয়োজনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ২১কে অনুধাবন করার চেষ্টা করতাম।

১৯৯১এ শুরু নতুন অধ্যায়, সৃবোচচ বিদ্যাপীঠ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। ২১শের মুল্যবোধে সব জায়গায় একই আবেগ, একই শ্রদ্ধা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ১৯৯২-প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল অন্যরকম। রাত বারোটা এক মিনিটে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, আমার ভাই এর রক্তে রাঙানো গান গাওয়া, নীরবতা পালন এসব মুহূর্ত আজও মনে গভীরভাবে গেঁথে আছে। আমরা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর গোলাম রহমান সার এর নেতৃত্বে, প্রথম ব্যচের ৪-ডিসিপ্লিনের ৮০ জনের প্রায় সকলেই এবং সকল শিক্ষক মনডলী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহ খুলনা শহরের প্রাণকেন্দ্র শহীদ হাদিস পার্ক-এর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ১২:০১ মিনিটের শ্রদ্ধার্ঘ্য এক অনন্য স্মরণীয় অধ্যায়। এবং সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা আমাদের পরিচালনায়। বিশ্ববিদ্যালয় এর ৫ টি বছর এর কোন ব্যতিক্রোম হয়নি।

১৯৯৭, কর্ম জীবনের ২১শে ফেব্রুয়ারি:
কর্মজীবনেও এই ধারাবাহিকতা থামেনি। বিখ্যত স্থপতি বশিরুল হক, স্থপতি শাহ আলম জহির উদ্দিনের ও রবি-উল হুসাইন এবং মুবাসসর হোসেন এর সান্নিধ্য ও ২১শে র তাৎপর্য অনুধাবন করি। ১৯৯৮এর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রভাতফেরীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি ১২:০০ টা ১ মিনিট থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত। ভাষা লাইন, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রীয় কুটনৈতিকরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ এর পর পেশাজীবীদের সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশের স্থপতি ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধিত্ব দলের একজন প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে গর্বিত অনুভব করেছি। পাশাপাশি আহসানুললাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ সথাত্য বিভাগের শিক্ষকতা করতে গিয়েও ছাত্রদের কাছে একুশের তাৎপর্য তুলে ধরেছি। ছাএদের নিয়ে ২১শের বই মেলায় গিয়েছিলাম ও বিশ্বসাহিত্য পাঠ্যচক্রে অংশগ্রহনের মাধ্যমে ২১শের তাৎপর্য তুলে ধরা প্রয়াস করেছি।

২০০৬ এ নিজের স্ত্রী-সন্তান (তাজরিন নুমাহ- তখন ৯ মাস বয়স) নিয়ে প্রথমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তটিও ছিল খুব আবেগঘন মনে হয়েছিল, একুশের উত্তরাধিকার এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলে।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, আর ২০০০ সাল থেকে সারা বিশ্বে এটি পালিত হচ্ছে। বিদেশে এসেও, বিশেষ করে সুইডেনে প্রবাস জীবনে, বাংলাদেশ দূতাবাসে এই দিনটি পালন করে আসছি ২০০৮ থেকে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে। ২১শে ফেব্রুয়ারি অনুভব ও স্মরণ করতে গিয়ে বারবার অনুভব করেছি ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি পরিচয়, ইতিহাস ও আত্মার অংশ।

শৈশবের সেই প্রথম উপলব্ধি থেকে আজ পর্যন্ত একুশ আমার ভেতরে রয়ে গেছে। এটি শুধু একটি দিন নয়, এটি আমাদের রক্তে মিশে থাকা স্মৃতি, আত্মত্যাগের শিক্ষা এবং ভাষার প্রতি ভালোবাসার অঙ্গীকার। একুশকে ভুলবার নয়। একুশ আমাদের ভেতরে বেঁচে থাকে, এবং বেঁচে থাকবে আগামী প্রজন্মের মাঝেও।

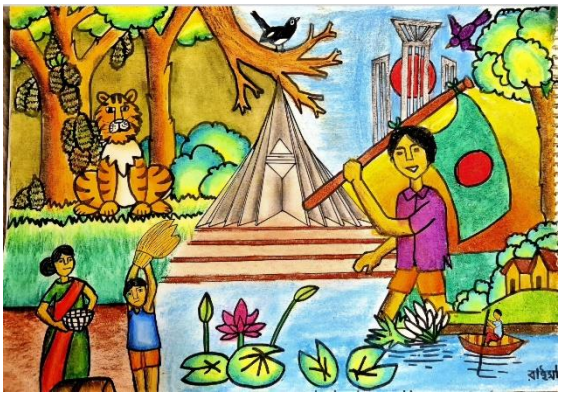

রাইসা | Firoz & Shimu – URP'00

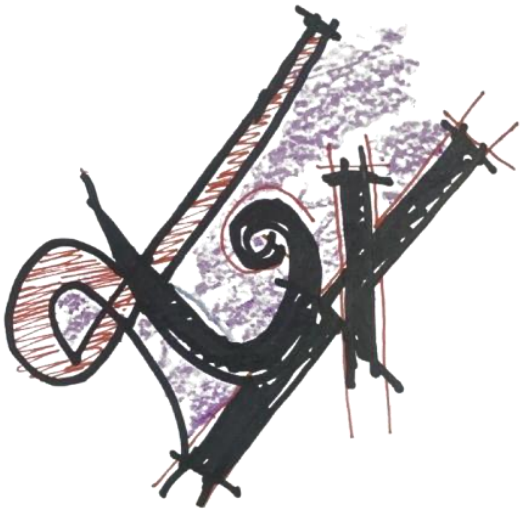

Riana | Firoz & Shimu – URP’00

সুলগ্না | Jiban K Ray – ECE’01

Fahima Alam Nise | Tanvir Alam, Econ’01

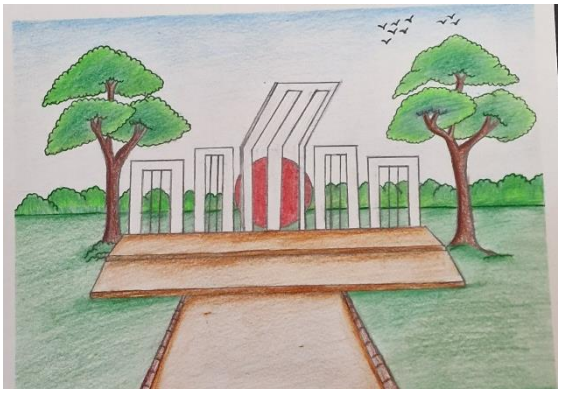

নাশিতা | MST Anjuman –SOC ’03

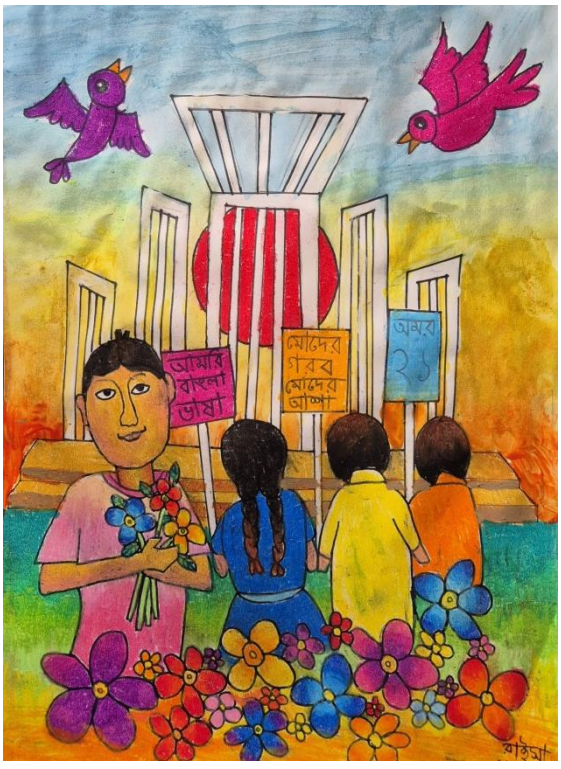

রাইসা | Firoz & Shimu – URP’00

Marisha | Alice and Mukta, URP 00

কথার কথা - ভাষার বেড়ে ওঠা

খুরশীদ হাসান সজীব - নগ্রাপ'৯৯

আজ বলবো একটি বেড়ে ওঠার গল্প, কথার কথা।
এ্যাঁ, আ, উঁ, ক, ফ, ম, মা, বৈচিত্রময় শব্দচয়ন,
ধীরে ধীরে বড় হয় শব্দ, প্রকাশ পায় কথার আবেদন।
কথারা হাত ধরাধরি করে খেলতে শুরু করে,
একে অন্যের কান্ডারী হয়, মমতা - মাধুর্যে মোহিত হয়,
সুখ-দুঃখের ভরসা হয়, বিপদের ঢাল হয়,
প্রকাশ করে নিজের অভিব্যক্তি, জানান দেয় অস্তিত্বের।
কথা এখন সাবালক, নবীন হাতে, সাবলীল ভাবে,
এখন সে, শব্দমালা গাঁথতে শিখছে, কিছুটা অগোছালো।
কিন্তু তাতে কি, চাহিদার জানান দিতে তা ই যথেষ্ট।
আস্তে আস্তে কথারা বড় হতে থাকে, ব্যঞ্জনা আসে দ্যোতনা নিয়ে।
কথারা সাজসজ্জা নিয়ে অলঙ্কারিত হয়, ব্যাকরণিক লব্ধ হয়ে,
যৌবনের চুরান্ত সীমানায় পৌঁছে কথারা ভাষায় পরিগণিত হয়।
এখন তারা স্বাধীন, একটি পরিপুষ্ঠ কাঠামোবেষ্টিত সতন্ত্র সত্তা।
এখন সে আন্দোলনের জন্য ব্যানার লিখতে পারে,
মিছিলে স্লোগান দিতে পারে, অগ্নিঝরা বক্তব্য প্রদান করে।
বিজয়াতিহাস লিখতে পারে, কবিতা, গান সবকিছুই।
আস্তে আস্তে সে রূপান্তরিত হয়, সংমিশ্রত হতে থাকে,
যত্নশীলতার অভাববোধ করে, ব্যবহারিক ও চর্চায় সংকীর্ণ হতে থাকে।
অনীহা আর অবহেলায় ভাষা আজ তার প্রৌঢ়ে উপনীত,
অতি আধুনিকতার ছোঁয়া আর বিমুখতার ফাঁদে আটকে পরা ভাষা,
প্রস্থানের প্রহর গুনতে থাকে ভাষা এখন ইতিহাসের দোরগোড়ায়।

বন ২০.০২.২০২৬

অক্ষরের পুনর্জন্ম: বিজয়, অভ্র ও বাংলা ভাষার ডিজিটাল যাত্রা

মিঠুন কুমার সমাদ্দার, এটি'০৫

আমি আশির দশকের মানুষ। মাগুরার প্রত্যন্ত গ্রাম কুল্লিয়ায় পৌষের শীতে জন্ম নেওয়া এক শিশু, যে জানত না ভবিষ্যতে ভাষাও প্রযুক্তির শরীরে বাসা বাঁধবে। বাংলা ভাষা কবে প্রথম উচ্চারণ করেছি জানি না, কিন্তু মনে আছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম কম্পিউটারের সামনে বসে বাংলা লিখেছিলাম। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, অক্ষর যেন কাগজ ছেড়ে আলোর পর্দায় নতুন জীবন পেল।

বাংলা ভাষার ডিজিটাল অভিযাত্রা সহজ ছিল না। আশির ও নব্বইয়ের দশকে বাংলা কম্পিউটিং ছিল বিচ্ছিন্ন, ফন্টনির্ভর ও অসংগঠিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আলাদা এনকোডিং পদ্ধতি ছিল; এক কম্পিউটারে লেখা অন্য কম্পিউটারে খুললে অক্ষর ভেঙে যেত। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই আসে বিজয় যা বাংলা টাইপিংকে একটি সুনির্দিষ্ট কিবোর্ড লেআউট ও কাঠামো দেয়। বিজয় ছিল একাধারে প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক ঘটনা। সংবাদপত্র শিল্প, প্রকাশনা জগৎ এবং দাপ্তরিক কাজে এটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়। প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষা ধারাবাহিকভাবে কম্পিউটারভিত্তিক মুদ্রণে ব্যবহার হতে শুরু করে। তবে বিজয়ের সীমাবদ্ধতাও ছিল এটি ছিল নন-ইউনিকোড নির্ভর, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট এনকোডিং ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। ফলে একই লেখা অন্য সিস্টেমে ভিন্নভাবে প্রদর্শিত হতো। বাংলা তখনও পুরোপুরি বিশ্বমঞ্চে প্রযুক্তিগত স্বীকৃতি পায়নি।

এই সংকটের সমাধান আসে ইউনিকোডের মাধ্যমে। **Unicode** এমন একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার প্রতিটি অক্ষরকে একটি স্বতন্ত্র কোড বরাদ্দ করা হয়। বাংলা অক্ষরও সেই সার্বজনীন মানচিত্রে জায়গা পায়। এর ফলে একটি ডিভাইসে লেখা বাংলা অন্য যেকোনো ডিভাইসে একইভাবে দেখা যায়। ভাষা হয়ে ওঠে প্রযুক্তিগতভাবে স্থায়ী, সংরক্ষণযোগ্য ও বৈশ্বিক। এই প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ঘটে **Avro Keyboard**-এর। অভ্র শুধু একটি সফটওয়্যার নয়, এটি ছিল ভাষাকে গণতান্ত্রিক করে তোলার এক বিপ্লব। ফোনেটিক পদ্ধতির কারণে ইংরেজি অক্ষরে উচ্চারণ অনুযায়ী টাইপ করলেই বাংলা তৈরি হয়—ফলে নতুন প্রজন্মের জন্য বাংলা লেখা হয়ে ওঠে সহজ ও স্বাভাবিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, অভ্র ইউনিকোড সমর্থিত হওয়ায় বাংলা সরাসরি বৈশ্বিক ডিজিটাল অবকাঠামোর অংশ হয়ে যায়।

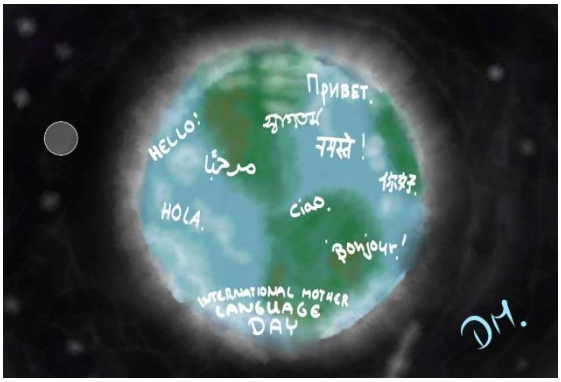

বাবুই। বিশ্বজিৎ মল্লিক (শুভ), নগ্রাপ'৯৪

প্রযুক্তিগত এই পরিবর্তন ভাষার সামাজিক চরিত্রও বদলে দেয়। একসময় বাংলা টাইপিং ছিল বিশেষজ্ঞদের কাজ; এখন তা হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের অভ্যাস। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশেষত **Facebook**-বাংলা ভাষাকে দিয়েছে এক নতুন জনপরিসর। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন বাংলা লিখছে কবিতা, প্রতিবাদ, ভালোবাসা, ব্যক্তিগত অনুভব, রাজনৈতিক মতামত। ভাষা আর কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন চলমান, সংলাপমুখর, বহুস্বরিক। আমি নিজেও অভ্র ব্যবহার করে অসংখ্য কবিতা লিখেছি, পত্রিকা সম্পাদনা করেছি। প্রতিবার বাংলা অক্ষর পর্দায় ফুটে উঠলে মনে হয়েছে এ যেন ভাষার পুনর্জন্ম। প্রযুক্তি এখানে কেবল যন্ত্র

নয়; এটি ভাষার বাহন, স্মৃতির ধারক, সংস্কৃতির রক্ষক।

তবে এই অর্জনের পেছনে রয়েছে ত্যাগের ইতিহাস। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বাংলার দাবী। আজ যখন আমরা সহজে, স্বচ্ছন্দে ডিজিটাল পরিসরে বাংলা লিখি, তখন সেই শহীদদের আত্মত্যাগের কথাই মনে পড়ে। প্রযুক্তির এই অগ্রগতি আসলে তাদের স্বপ্নেরই এক সম্প্রসারণ বাংলা ভাষা যেন বেঁচে থাকে, বিকশিত হয়, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বিজয় আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে অক্ষরকে যন্ত্রে স্থাপন করতে হয়; অভ্র আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে সেই অক্ষরকে সবার করে তুলতে হয়; আর ইউনিকোড দিয়েছে ভাষাকে বিশ্বমানের স্বীকৃতি। এই তিনের সম্মিলিত যাত্রায় বাংলা ভাষা কাগজ থেকে স্ক্রিনে, সীমা থেকে অসীমে পৌঁছেছে। আমাদের প্রজন্ম সেই পরিবর্তনের সেতু গ্রামের শীতল সকালের উচ্চারণ থেকে ডিজিটাল আলোর পর্দায় বাংলা অক্ষরের দীপ্তি পর্যন্ত। ভাষা এখন শুধু স্মৃতি নয়, প্রযুক্তির শরীরে বেঁচে থাকা এক জীবন্ত সত্তা।

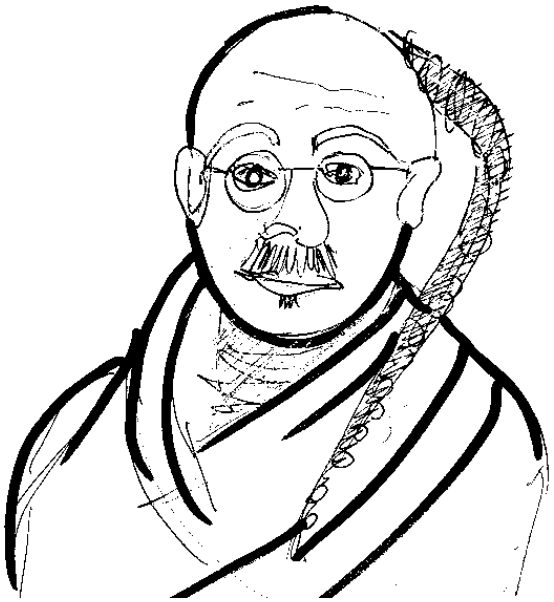

আমার শহরে

মফিজ রহমান, ইএস'০০

এখানে শহরের দেয়ালে
বস্টন আইভি ঝুলে থাকে না
লেগে থাকে ছিটকে যাওয়া মগজ,
চাপচাপ রক্তের ছাপ।

এখানে শীতের সকালে
খেজুররসে মুড়ি ভিজিয়ে খেতে খেতে,
আততায়ীর গুলিতে চোখ হারিয়ে
অন্ধ হয়ে যান সাইফুল্লাহ।

এখানে উন্নয়নের স্প্রিংয়ের ধাক্কায়
খুন হয়ে যায় মানুষ।
এখানে রাস্ট্র এখনো বুনো শুয়োরের মত
দাঁত বের করে হাসে।
মৃত্যু আর খুনের সহজ সমীকরণ
কঠিন করে তোলে
আনমনে হেঁটে চলা আবুল কালামদের।

এখানে নতুন নতুন গাণিতিক সমস্যার ভিড়ে
পুরোনো সমস্যা গুলো পড়ে থাকে
ঠিক যেন পণ্ডিত মশায়ের কুকুরের ঠ্যাংয়ের মতো
অমীমাংসিত, অপ্রয়োজনীয়।

এখানে বুকে চাপা কষ্ট নিয়ে
বেঁচে থাকে আইজুদ্দিন,
আর পালাতে চায় সুবোধ।

এখানে জীবন এখনো
বিক্রি হয় সের দরে

ঝোলা গুড়ের মত।
পুরোনো খবরের কাগজের সঙ্গে
বিক্রি হয়ে যায় ভালোবাসাও।

এখানে ছিপি খোলা কাচের বোতল থেকে
কর্পূরের মতো উড়ে যায় রংবেরঙের ইস্যু,
আর কবিতার শব্দ বুকে নিয়ে-
চা-চপ-সিঙ্গাড়ার দোকানে
পড়ে থাকে ঘামে ভেজা টিস্যু।

বার্লিনের চিঠি
রচনাস্থান - ব্রেমেন
মিউজিশিয়ানদের শহর।
২০২৫

একজীবনে

আজ যদি আমাকে প্রশ্ন করো
খোদার দেয়া মূল্যবান এ জীবন দিয়ে
দুনিয়ায় কি করলাম?

বাবার সাথে বাগান করতে যেয়ে
গাছ থেকে আগাছা পৃথক করলাম ।
মার সাথে রান্নাঘরে বসে
পায়েস রাঁধার চাল থেকে চিটে বাছলাম ।

অজস্র ডানা ভাঙা প্রজাপতির
সযত্নে ডানা জুড়ে দিলাম ।
যদিও ডানা পেয়ে প্রজাপতিরা কেউ থাকেনি,
সব একে একে উড়ে চলে গেলো।
আর বাকি সময়
অন্ধকারে অপেক্ষা করলাম,
পূর্ণিমার ফিনকি দিয়ে ফোঁটা
জ্যোৎস্নার প্রতিক্ষায়॥॥

বার্লিনের চিঠি
রচনাস্থান – মুনসটার
২০২৫ এর পাতাঝরার মৌসুমে

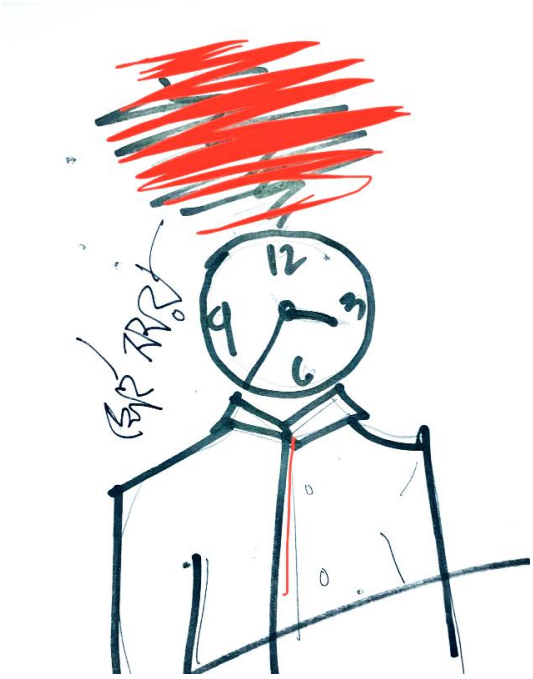

আমাদের সময়

আমি সেই সময়ের কথা বলছি
যখন থালায় পড়ে থাকা দুধ মাখা ভাত কাকে খেতো,
আর জুতার শুকতলার নিচে থাকতো অজস্র পেরেক।
আমাদের চোখ থাকতো বড় ভাইয়ের পুরোনো জামায়
ফেলে দিলেই দখল নেবো,
যেভাবে দখল হয় জমি।

আমাদের পাঠ্যবইগুলো দাগানো থাকতো
ইকোনো কলম কিংবা HB পেন্সিলে
কারণ সেগুলো কয়েক হাত ঘুরে
শেষে এসে আশ্রয় নিতো
আমাদের ছোট্ট পড়ার টেবিলে।

মায়েরা বোতাম সেলাই করে দিতো,
আর রিপু করে নেওয়া যেত পুরোনো জিন্সের প্যান্ট।
হলুদ-মরিচে ভেজে নিলে জেগে উঠত
গতরাতের ফেলে যাওয়া অবশিষ্ট ভাত,
আর সেই ভাতেই হয়ে যেত আমাদের সকালের আহার।

আমাদের ছিলো অখণ্ড অবসর
দুপুরে খাবার পর কাকেরা ঝিমাতো নারকেলের ডালে,
আর আমরা গল্পের বই হাতে শুয়ে পড়তাম বিছানায়।
আমাদের হাতে সময় ছিলো
পায়ে হেঁটে শহরের বাইরে যাওয়ার,
বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করার,
চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারার,
বা সময়ের সঙ্গে কানামাছি খেলার।

আমাদের প্রেম মন থেকে শরীরে গড়াতে
লেগে যেত এক দশক
তবু সময়ের কোনো দুর্ভিক্ষে পড়িনি কখনও।

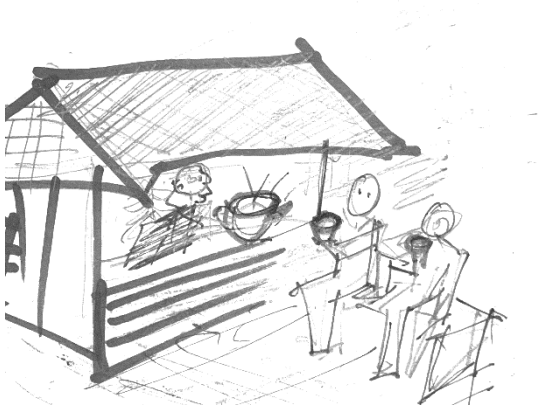

বৃষ্টি হলেই রাস্তায় হাঁটু জল জমত না,
কিন্তু সিনেমার শেষ দৃশ্যে
চোখ ভিজে যেত অবধারিতভাবে।
মসজিদের আজান কেবল কানে নয়,
পৌঁছাতো মনের গভীরে।

শবেবরাতে আমরা আনন্দ করতাম
রুপালি ট্রেতে করে হালুয়া, রুটি, বরফি
নিয়ে ঘুরতাম প্রতিবেশীর বাসায়।
ট্রে আর বাটি ফিরতো
সুগন্ধি পায়েস,
কিংবা হাঁসের মাংস দিয়ে ভরপুর হয়ে।

ফাঁকা বাটি ফেরত দেবার রেওয়াজ ছিলো না তখন।

পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে হাত কাটলে
প্রতিবেশীরা ছুটে আসতো দূর্বা ঘাস হাতে,
শাড়ির আচল ছিঁড়ে বেঁধে দিতো ব্যান্ডেজ।

বাড়িতে অতিথি এলে
আমাদের মনটা ঈদের মতো ফুরফুরে হয়ে যেত।
পড়াশোনা শিকেয় উঠত,
মা আমাদের বকতে পারতেন না প্রতিবেশীর সামনে।
"ভবিষ্যতে কী হবে"
এই প্রশ্ন আমাদের সিলেবাসেই ছিলো না।

অতিথি এলে আমরা খাট ছেড়ে মাদুরে ঘুমাতাম।
ভালো-মন্দ রান্না হতো,
আমরা সারা মহল্লা দৌড়ে ধরে আনতাম
লাল ঝুঁটি ওয়ালা পোষা মোরগ।

অতিথির সাথে আমরা যেতাম নাইট শোতে সিনেমা দেখতে
যেখানে অন্য সময় সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকতো।
রাতের পৃথিবী তাই ছিলো অজ্ঞাত ।

আমাদের শাসন করতো গোটা মহল্লা
সিগারেট খেতে গেলে হেঁটে যেতে হতো কয়েক মাইল।
আমাদের বিকেল কাটতো খেলার মাঠে,
সন্ধ্যা কাটতো ছাদে।
পাখিদের ঘরে ফেরা,
সুতা কেটে যাওয়া ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতাম চুপচাপ।
আমাদের চোখের সামনে
শুকনো কাপড় দড়ি থেকে তুলে নিচে নামতো বিলাসী
আমাদের হৃদয়ে নেমে আসতো অমাবস্যা।

আমরা চাইতাম,
সন্ধ্যাটা একটু দীর্ঘ হোক,
আর বিলাসী ফসল তোলার মতো
অন্তহীন ধৈর্যে দড়ি থেকে তুলুক শুকিয়ে যাওয়া কাপড়।

আমাদের ব্যক্তিগত বলে কিছু ছিল না
দুঃখ ছাড়া।
সুখ এলে,
নিজে জানবার আগে বন্ধুরা জেনে যেত।

আমরা বাবাকে ভয় পেতাম
আর মা সিন্দুকে কে লুকিয়ে রাখতেন
আমাদের শত অন্যায়।
ধর্ম ছিলো আমাদের গায়ে আতরের মতো
স্নিগ্ধ,
উৎসবমুখর।

আমরা অপেক্ষা করতাম রমজানের,
সুস্বাদু ইফতারের।
তারাবিতে বন্ধুদের সঙ্গে খতম পড়তে যেতাম,
কখনও ঘুমিয়ে পড়তাম সিজদায়।

সবকিছু আমাদের টানতো
শুধু পাঠ্য বই ছাড়া।
বন্ধুর খাতা দেখে লিখেই
পাস করা যেতো পরীক্ষায়।

এখন আর কোনো পরীক্ষায় পাস করতে পারি না।
সময়ের বড়ই অভাব।
বন্ধুরা হারিয়ে গেছে।
ধর্ম এখন কঠিন আর বিপদসংকুল।
আমাদের আত্মারা সব মরে গেছে।

টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছি কেবল নশ্বর শরীর
যেভাবে গোবিন্দ বড়বাজারে
টেনে নিয়ে যায়
বস্তাভর্তি কাটা মুরগির পাখনা আর মাথা।

মফিজ রহমান
রচনাস্থান - বার্লিন
অক্টোবরের রাত ২০২৫

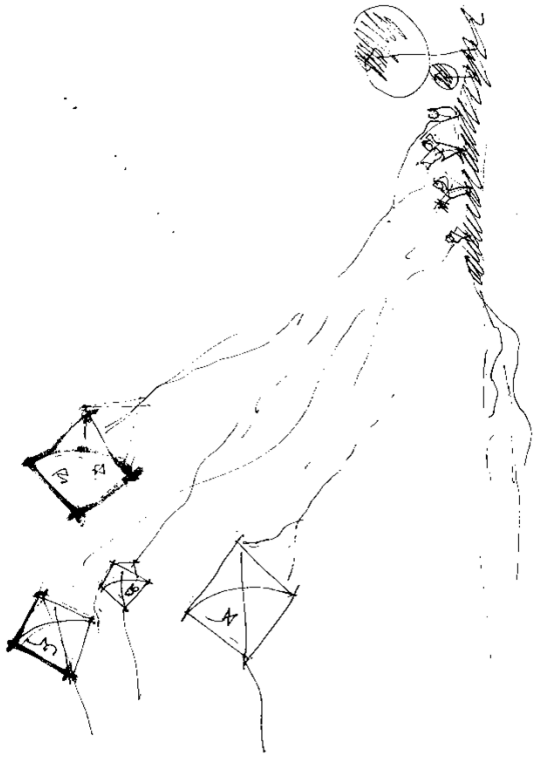

আমার দুরন্ত সেনারা

সৈয়দ মোর্শেদ কামাল, বিবিএ'৯৪

ক' দিন ধরে অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই দেখি লঙ্কাকাণ্ড চলছে। আমার পুত্র-কন্যা সন্ধ্যের সময় খেলাধূলা সেরে বাড়ি ফিরেছে, আর তাদের অবস্থা দেখে তাদের মায়ের ত্রাহি চিৎকার! দুটোরই দেখার মত চেহারা হয়, ধুলো-কাদায় মাখামাখি- কিম্ভূত কিমাকার! তারা তাদের মায়ের কথাকে খুব একটা গা করে না। দুজনে শুধু ফিসফিস করে কথা বলে আর হাসে।

আমি এক ছা-পোষা চাকরিজীবী। স্ত্রী শম্পা, ৯ বছরের আদিব আর ৭ বছরের সুহাকে নিয়ে আমার ছোট সংসার। রোজ সকালে অফিস যাই, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে চা খেতে খেতে টিভি দেখি। মাঝে মাঝে ছেলে মেয়েদের এক আধটু পড়া দেখিয়ে দেই, সবাইকে নিয়ে কখনও রেস্টুরেন্টে খেতে যাই। ব্যাস, এই আমাদের জীবন- গৎবাঁধা, নিতান্ত নিরীহ।

কিন্তু, আমার এই রুটিন বাঁধা জীবন গত কিছুদিন ধরে খানিকটা এলোমেলো। শম্পার অনুযোগ, "প্রতিদিন এভাবে বাচ্চারা কাদা মাখিয়ে বাড়ি ফিরলে কেমন লাগে! আমি তো বলে বলে ক্লান্ত। মারের ভয় দেখিয়েও লাভ হচ্ছে না। তুমি একটু দেখ না প্লীজ । তা না হলে আমি যে দিকে দু' চোখ যায় চলে যাব।" দু চারদিন অপেক্ষা করলাম, কিন্তু দু' চোখ যেদিকে যায় সে দিকে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখলাম না। বরং ঘরের অবস্থা আরও উত্তপ্ত হল।

শেষ পর্যন্ত সংসারের শান্তি রক্ষার্থে ছেলে-মেয়েদের ডেকে বললাম, 'অনেক হয়েছে,এবার থামাও। এভাবে প্রতিদিন মা কে কষ্ট দেয়ার মানে কি?'

ওরা শুধু মৃদু হাসে। বলে, "বাবা আর ক' টা দিন। মাঝে মাঝে দেখি দু' জনে একসাথে ইন্টারনেটে কি যেন ঘাঁটাঘাঁটি করে। কিন্তু, ঘরের অশান্তি কমে না। ধুলো-কাদায় মাখামাখি চলতেই থাকে।

এক শুক্রবারে ঠিক করলাম, ব্যাপারটা একটু দেখব। ভাতঘুম হারাম করে ঘাপটি মেরে শুয়ে রইলাম। বিকেলে ছেলে-মেয়ে বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে ওদের পিছু নিলাম। দেখলাম, ওরা দুজন আমাদের বাড়ির পেছন দিকের একটি খালি জমিতে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখি আমাদের প্রতিবেশী শেফালী ভাবী তার ২ বছরের মেয়ে হৃদিতা কে কোলে নিয়ে হাজির। শেফালী -অভিক দম্পতির বড় মেয়ে হৃদিতা, জন্ম থেকেই শারীরিকভাবে পুরো সুস্থ নয়। সারাক্ষণ বিছানায় শুইয়ে রাখতে হয়, উঠে বসতে পারে না, হাঁটা তো দূরে থাক! মেয়েকে সুস্থ করে তোলার জন্য শেফালী -অভিক দম্পতির চেষ্টার অন্ত নেই, দেশ-বিদেশে ডাক্তার দেখিয়েছেন। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এখনও বসতে বা দাঁড়াতে পারে না। ফিজিওথেরাপির সময় বাচ্চাটা খুবই বিরক্ত হয়; কাঁদে আর ভয় পায়।

একদিন ওদের বাসায় বেড়াতে গিয়ে আদিব আর সুহা এ কাহিনী শুনতে পায় । বাড়িতে ফিরে ওরা এটি নিয়ে ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করে, জানতে পারে মাটিতে গর্ত করে বাচ্চাদের দাঁড় করিয়ে রেখে পেশী দৃঢ় করার একটি পদ্ধতি রয়েছে। সেই থেকেই গল্পের শুরু।

আদিব সুহা ছোট একটি গর্ত তৈরি করে। প্রতিদিন হৃদিতাকে নিয়ে সেই গর্তে দাঁড় করিয়ে রাখে, ও যাতে বিরক্ত না হয় সে জন্য নানা ভাবে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করে। জল-কাদায় মাখামাখি হয়। হৃদিতাও মহা খুশী । আগের সেই বিরক্তি নেই!

আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওদের কাজ দেখলাম। ভাবী আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর দু' চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। তিনি বললেন, "ভাই, হয়ত ওরা প্রতিদিন বাসায় বকুনি খায়। কিন্তু ওরা একদিনের জন্যও হাল ছাড়েনি। আমরা যা পারিনি, ওরা তাই পেরেছে। আজ আমার মেয়ে দাঁড়াতে শিখেছে।" আমি স্মিত হেসে চলে এলাম।

বাড়ি ফিরে শম্পাকে বললাম, ওরা যা করছে করতে দাও। তোমার খাটুনি না হয় একটু বেড়েই গেল!

শেষের গল্পঃ
হৃদিতা কে নিয়ে আদিব সুহার যুদ্ধ অব্যাহত রইল। ওদের সাথে যোগ দিল আমাদের পাড়ার আরও অনেক শিশু- মারিশা, মাটি, জেভিয়ার, ফ্রেয়া ও আরও অনেকে । এর মধ্যে একটি বছর পেরিয়ে গেছে!
আজ আমাদের পাড়ায় ভাষা দিবসের প্রভাতফেরী । সবাই ফুলের তোড়া হাতে, গান গাইতে গাইতে শহীদ মিনারের দিকে হেটে যাচ্ছে । সব ভাইয়া আপুদের সাথে একই তালে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ৩ বছরের হৃদিতা । আজ তো ওই সবচেয়ে বড় বিজয়ী!

শিশুদের পরস্পরের জন্যে ভালবাসা বেঁচে থাকুক চিরকাল। ভাষা দিবসে পৃথিবীর সকল যোদ্ধা বাবা-মায়ের জন্যে বিনম্র শ্রদ্ধা।

সুলগ্না | Jiban K Ray – ECE’01

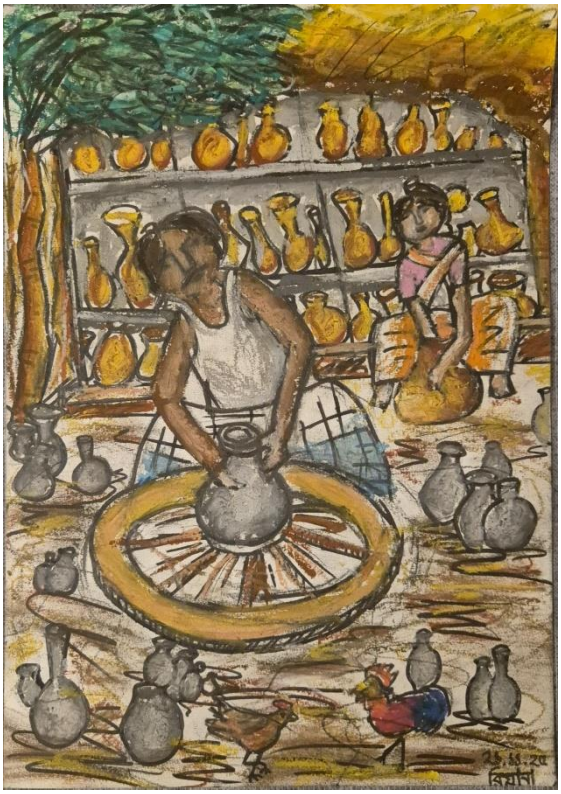

Riana | Firoz & Shimu – URP’00

স্মারক | Jiban K Ray – ECE’01

আয়াত | Fuad Amin Roni –URP ’04

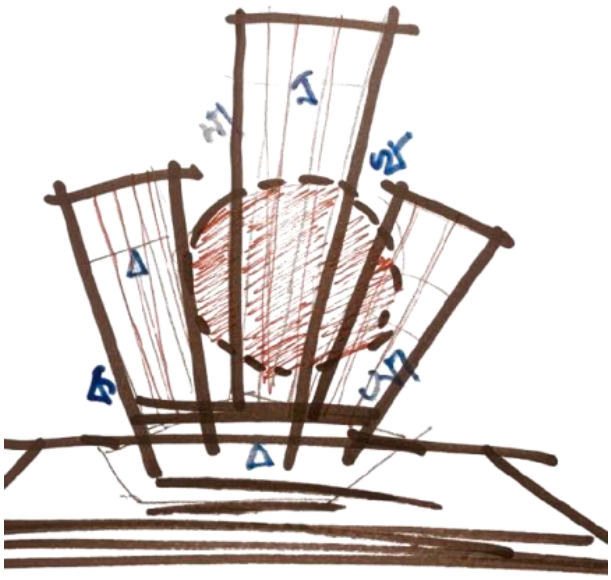

Train to Samarkand/ ট্রেইন টু সমরকন্দ

রফিক, নগ্রাপ'৯৫

হোটেল থেকে ভীরু পায়ে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। একটি ট্যুর কোম্পানির সাথে আজ আমার সমরকন্দ যাওয়ার কথা। তাদের সঙ্গে শুধু একটি কথা হয়েছে, সকাল সাড়ে সাতটায় হোটেলের সামনে রাস্তায় যেন দাঁড়িয়ে থাকি।

হোটেলে নাস্তা দেয় সকাল আটটা থেকে। ভেবেছিলাম আজ নাস্তা জুটবে না কপালে, কিন্তু চেষ্টা করতে দোষের কি! হোটেলের রেস্টুরেন্টে ঢু মারতেই গোলগাল চেহারার এক মধ্যবয়সী মহিলা একগাল হেসে বললেন " ব্লেক ফাস্? ওয়েলকাম"। এদেশের মানুষ শুধু রাশিয়ান আর উজবেক ভাষা বলে- দুহাতে কিলালেও পেট দিয়ে ইংলিশ বের হয় না,
কিন্তু আমি বাঙালি, এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র আমি নই। আকার ইঙ্গিতে ইশারায় গত কয়েকদিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছি দেদারসে।

দ্রুত নাস্তা সেরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, কল্পনায় ভাবছি একদল হাসি খুশি টুরিস্টসহ, কোম্পানি তাদের গাড়ি নিয়ে আমাকে নিতে আসবে। কিন্তু যথাসময়ে দেখলাম ছোট্ট একটি শেভ্রলেট এসেছে, আমাকে একা নিয়েই রেল স্টেশনের দিকে ছুটে চলল। রেলস্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই দেখলাম ফোনে একটি বার্তা এসেছে" তোমাকে ট্রেনের টিকিট পাঠানো হলো, একা একা চলে যাও সমরকন্দ, নামার পরে গাইড বেগ সাহেব অভ্যর্থনা জানাবে" । মনে মনে ভাবলাম একাই যদি যাব, তাহলে ব্যাটা তোদের সাথে যেয়ে লাভ কি!

এক মুহূর্ত দেরি না করে ট্রেন ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ পর দেখি সবাইকে নাস্তা এবং চা/ কফি পানি দেয়া হচ্ছে।

আমার কাছে এদেশের টাকা কিছু কম থাকায়, কফিতে চুমুক দেয়া থেকে বিরত থাকলাম। দেখি সবাই কেউ খেতে শুরু করলো, কেউবা আবার ব্যাগে ভরতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে জানলাম ট্রেনে সবাইকে বিনা পয়সায় নাস্তা, চা, পানি দেয়া হয়।

আমার ট্রেন ছুটে চলেছে তাসখন্দ থেকে সমরকন্দ। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন শহর ছেড়ে খোলা চাষের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করল, অনেক জায়গায় মাইলের পর মাইল কোন জনবসতি দেখা যায় না, মাঝে মাঝে দু একটি গাধা, ভেড়া, গরু গোছের প্রাণী ক্ষেত থেকে কিছু খাবার চেষ্টা করছে। আমি ঘন বসতির দেশের মানুষ, এইরকম বড় ফাঁকা জায়গা দেখলে, বুকের মাঝে হু হু করে ওঠে।

ট্রেন তখনো এক ঘন্টা পৌঁছাতে বাকি, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমার ফোনে কোন নেটওয়ার্ক নাই। নাইতো নাই, আমার পেটে যত বিদ্যা ছিল, সব খাটিয়ে কোন শুরাহা করতে পারলাম না। মনে মনে ভীষণ শঙ্কিত হলাম, আমাকে বা কিভাবে বেগ সাহেব চিনবেন, কিংবা আমিই বা তাকে কিভাবে চিনবো? নামার পরে ১০-১৫ মিনিট পার হয়ে গেল, যাত্রীরা যার যার গন্তব্যে রওনা হয়েছে, আর আমি বেগ সাহেবকে খুঁজছি।

কিছুক্ষণ পরে অল্প বয়সী এক যুবক আমার কাছে এসে জানতে চাইলো, আমাকে তাসখন্দ থেকে শাহরুখ পাঠিয়েছে কিনা? হ্যাঁ বলতেই বলল গাড়িতে উঠুন। আহা, এ যেন সাক্ষাৎ দেবদূত- বহুকাঙ্খিত বেগ সাহেব! আমি বললাম আর সবাই কোথায়? উনি বললেন আমার দলে আমি একাই!

যাহোক চকচকে গাড়িতে করে প্রতাপশালী সম্রাট আমির তিমুর (তৈমুর লং) এর সাম্রাজ্যের রাজধানী সামারখন্দে একে একে নামকরা স্থানগুলো দেখতে লাগলাম। রেজিস্তান স্কয়ারে ১৪ ও ১৭ শতাব্দীর তিনটি মাদ্রাসা, গোল্ডেন মস্ক দেখে দুপুরে খেতে গেলাম। উঝবেকিস্তানের এক ট্র্যাডিশনাল রেস্টুরেন্টে (চয়হোনা) খেতে খেতে, কথা ও কাজে পটু বেগ সাহেব একে একে আমাকে সামার খন্দের গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করে যেতে লাগলেন।

মধ্যাহ্নভোজনের পরে তৈমুর লং এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী Bibixonim বিবিজনিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, তার সমাধি সৌধ, সিওব বাজার দেখা শেষে, তৈমুর লং এর সমাধি সৌধ দেখতে চললাম।

সম্রাট তৈমুর লং এর সমাধি, ভাস্কর্য, তার ও তার বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সুবিশাল স্থাপত্য আর সম্রাটের হেরেম খানা (অন্দরমহল) দেখে আমার সময় কাটতে লাগলো। গাইড জানালেন সম্রাটের ন্যূনতম ১৭ জন স্ত্রী ছিলেন। আমি কল্পনায় ভাবতে লাগলাম এই নারীরা কি এই প্রচন্ড প্রতাপশালী সম্রাটের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতেন, না নির্যাতিত মনে করতেন। বেগ সাহেবের ডাকে আমি কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। দ্রুত পা বাড়ালাম সামারখানদের ফুল ফল আর লেবু মিশ্রিত বিশেষ চা খাবার জন্য।

নীল বসফরাস থেকে শ্বেতশুভ্র বেলজিয়াম: এক স্বপ্নযাত্রার রোজনামচা

মনিরুল ইসলাম, এটি'০৬

বিমান যখন ঢাকার রানওয়ে ছাড়ল, জানালার বাইরে আলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। শহরটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে একসময় আলোর মানচিত্রে পরিণত হলো। মনে হচ্ছিল - আমি কি সত্যিই চলে যাচ্ছি? নাকি কোনো দীর্ঘ স্বপ্নের শুরু? গন্তব্য বেলজিয়াম - পিএইচডির নতুন অধ্যায়। জীবনের পাণ্ডুলিপিতে যখন পিএইচডি নামক নতুন অধ্যায়টি যুক্ত হলো, তখনো জানতাম না এই যাত্রা আমাকে কতটা সমৃদ্ধ করবে। প্রিয় বাংলাদেশ থেকে বেলজিয়াম, মাঝখানের হাজার মাইলের পথ পাড়ি দিতে গিয়ে আমি কেবল ভূগোল বদলাইনি, বদলেছি দেখার দৃষ্টিও।

ইস্তাম্বুলের মায়াবী ক্যানভাস

যাত্রাপথে বিরতি ছিল তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। ট্রানজিটের স্বল্প সময়, কিন্তু সেই কয়েক ঘণ্টাই যেন ছিল ইতিহাসের এক জাদুকরী পাঠ। বিমান থেকে নেমেই বুঝলাম, এই শহর শুধু শহর নয়, এ এক দীর্ঘ ইতিহাসের শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মিলনমেলা। এশিয়া আর ইউরোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক জীবন্ত সেতু। প্রথম সন্ধ্যাতেই আমি পৌঁছে গেলাম বসফরাস প্রণালির ধারে। জলরাশি এখানে নীল নয়, যেন রঙ বদলানো আয়না।

এক পাশে ইউরোপ, অন্য পাশে এশিয়া, আর মাঝখানে আমি। ফেরি ভেসে চলেছে আপন গতিতে, বাতাসে নোনা গন্ধ, দূরে আজানের সুর মিলিয়ে যাচ্ছে গাঙচিলের ডাকে। মনে হচ্ছিল, আমি কোনো ভূগোল বইয়ের পাতার ভেতর হাঁটছি - সময় যেন এখানে থমকে গেছে, আর নীল জলরাশির ওপর দিয়ে ভেসে আসা হিমেল হাওয়া যেন কানে কানে বলে যাচ্ছিল হাজার বছরের পুরনো গল্প।

পরদিন গেলাম হাজিয়া সুফিয়ার সামনে, প্রথম দর্শনেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এর গম্বুজ আকাশকে ছুঁতে চায় না - আকাশকে নিজের ভেতর টেনে নেয়। দেয়ালে ইতিহাসের স্তর জমে আছে -বাইজেন্টাইন, উসমানীয়, প্রার্থনা আর পরিবর্তনের অনন্ত গল্প। সে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। গম্বুজের নিচে দাঁড়িয়ে যখন ওপরের দিকে তাকালাম, নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র মনে হলো। স্থাপত্যের কী নিপুণ কারুকাজ! শত শত বছর ধরে এই দেওয়ালগুলো কত উত্থান-পতন দেখেছে, তা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যতবার তাকিয়েছি, চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছি। মনে হচ্ছিল, ইস্তাম্বুলের প্রতিটি ধূলিকণা যেন শিল্পের একেকটি মাস্টারপিস। সেদিনই আমি বুঝেছি,মানুষের কল্পনা কত বিশাল হতে পারে! ক্যামেরা দিয়ে ছবি নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু অনুভব করেছি - এই সৌন্দর্য ফ্রেমে আটকে রাখা যায় না। ইস্তাম্বুল আমাকে শিখিয়েছে - একটি শহর কেবল রাস্তা আর ভবনের সমষ্টি নয়; এটি সময়ের স্তর, সংস্কৃতির সংলাপ।

বেলজিয়াম: ইউরোপের হৃদস্পন্দন

ইস্তাম্বুলের মায়া কাটিয়ে যখন বেলজিয়ামে পা রাখলাম, তখন দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ এক অন্য পৃথিবী। পরিপাটি রাস্তাঘাট, ট্রামের ঝনঝন শব্দ, আর ইউরোপিয়ানদের ছকে বাঁধা জীবনযাপন। এখানকার শহুরে সৌন্দর্যে এক ধরণের আভিজাত্য আছে। প্রাচীন দালানগুলোর কারুকাজ আর আধুনিকতার মিশেল আমাকে মুগ্ধ করেছে। মনে হয় যেন কোনো দক্ষ শিল্পী পেন্সিল দিয়ে পুরো শহরটাকে এঁকে রেখেছে।

ইউরোপের প্রথম সকাল ছিল অদ্ভুত শান্ত। কোনো হর্ন নেই, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। ট্রাম নির্দিষ্ট সময়েই আসে, সাইকেল আরোহীরা নিজস্ব লেনে ছুটে চলে। পুরোনো পাথরের ভবন, কাঁচের দেয়ালে ঘেরা আধুনিক স্থাপনা, দুটো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে - যেন অতীত আর বর্তমানের সহাবস্থান।

এখানকার মানুষদের জীবনযাপন আমাকে মুগ্ধ করেছে - সংযত, পরিকল্পিত, সময়নিষ্ঠ। ক্যাফেতে বসে দেখেছি, কফির কাপ হাতে তারা নীরবে কথা বলছে; কেউ বই পড়ছে, কেউ ল্যাপটপে কাজ করছে। শহুরে সৌন্দর্য এখানে চিৎকার করে না - নীরবে আপনাকে আকৃষ্ট করে। এখানে আসার পর আবহাওয়ার যে বিচিত্র রূপ দেখলাম, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। এই রোদ তো এই মেঘ, আবার মুহূর্তেই ঝুম বৃষ্টি। আবহাওয়া যেন তার মুড সুইং করে প্রতি ঘণ্টায়!

জীবনের প্রথম তুষারপাত: একটি শ্বেতশুভ্র বিস্ময়

তবে জীবনের সেরা চমকটা অপেক্ষা করছিল এক শীতের সকালে। ঘুম থেকে উঠে জানালার পর্দাটা সরাতেই আমি এক অসম্ভব সৌন্দর্যের সাক্ষি হলাম। বাইরে তখন তুলোর মতো সাদা বরফ পড়ছে। জীবনে প্রথমবারের মতো স্নোফল দর্শন! ছোটবেলায় বইয়ে পড়া বা সিনেমায় দেখা সেই দৃশ্য আজ আমার চোখের সামনে জীবন্ত।

তাড়াহুড়ো করে জ্যাকেট গায়ে দিয়ে নিচে নেমে এলাম। হাত বাড়িয়ে আকাশ থেকে পড়া তুষারকণা ছুঁয়ে দেখার অনুভূতিটা - লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। চারদিক নিস্তব্ধ - গাছপালা, রাস্তাঘাট, পার্ক করা গাড়ি - সব ঢেকে গেছে সাদা চাদরে। হাড়কাঁপানো শীত, তবুও মনের ভেতর এক অদ্ভুত উষ্ণতা। মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো রূপকথার রাজ্যে দাঁড়িয়ে আছি। প্রকৃতির এই রূপ যে এতটা সুন্দর হতে পারে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

যাত্রার ভেতরের যাত্রা

ইস্তাম্বুল আমাকে বিস্মিত করেছে তার নাটকীয়তায়। বেলজিয়ামের ঘেন্ট শহর আমাকে মুগ্ধ করছে তার স্থিরতায়।
একটি শহর তরঙ্গের মতো - আবেগময়, ইতিহাসের গাঢ় রঙে আঁকা। অন্যটি নদীর মতো - নিয়ন্ত্রিত, শান্ত, গভীর। কিন্তু এই ভ্রমণের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার বাইরের পৃথিবী নয় - ভেতরের অনুভব। দুই মহাদেশ পেরিয়ে এসে বুঝেছি, ভ্রমণ মানে কেবল স্থান পরিবর্তন নয় - এটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন - নিজেকে নতুন আলোয় দেখা।

ইস্তাম্বুলের গম্বুজ আর বসফরাসের ঢেউ আমাকে শিখিয়েছে বিস্ময়।
বেলজিয়ামের শহুরে শৃঙ্খলা শিখাচ্ছে ধৈর্য ও মনোনিবেশ।
আর আমি?
আমি দাঁড়িয়ে আছি এই দুই অভিজ্ঞতার মাঝখানে - একজন ছাত্র, একজন পথিক, একজন গল্পসংগ্রাহক।
এই যাত্রা কেবল পিএইচডির জন্য নয়, এটি পৃথিবীকে নতুন করে পড়ার জন্য-
আর নিজের ভেতরের মানচিত্রটাকে একটু একটু করে বড় করার জন্য।

শেকড়ের টান

এত সৌন্দর্য, এত নতুনত্ব, ইউরোপের এই চাকচিক্য - সবকিছুর মাঝেও দিনের শেষে যখন নিজের ছোট্ট ঘরটায় ফিরি, তখন এক গভীর নীরবতা আমাকে গ্রাস করে। জানালার বাইরে হয়তো ঝকঝকে আধুনিক শহর, কিন্তু মনের জানালায় ভেসে ওঠে আমার প্রিয় বাংলাদেশের সেই চিরচেনা সবুজ ধানক্ষেত। বেলজিয়ামের ছোট্ট ঘেন্ট শহরের এই নিস্তব্ধ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করে ঠিকই, কিন্তু তৃপ্ত করতে পারে কি? বসফরাসের নীল জল দেখে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমার দেশের পদ্মা-মেঘনার ঘোলাজলের মায়া কি ভুলতে পেরেছি? ইউরোপের সাজানো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় ঢাকার সেই কোলাহল, রিক্সার টুংটাং শব্দ।

বিশেষ করে যখন আকাশ মেঘলা করে আসে, তখন বড্ড মনে পড়ে যায় আমার প্রিয়জনদের। চোখের সামনে ভেসে উঠে অতি পরিচিত মুখগুলো- আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এবং প্রাণপ্রিয় সন্তান। নিঝুম রাতের দূর আকাশের চাঁদ দেখে- আমার খুব করে মনে পড়ে যায় - মায়ের কথা, হিমেল হাওয়ায় যেন ভেসে আসে বাবার গলার আওয়াজ। একে একে মনে পড়ে যায় সবার কথা - এই স্মৃতিগুলো বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে হয়, পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য এক পাল্লায় আর প্রিয়জনদের ভালোবাসা অন্য পাল্লায় দিলে, ওই ভালোবাসাটাই জিতে যাবে।

বেলজিয়ামের এই পিএইচডি জীবন, ল্যাব, রিসার্চ আর তুষারপাতের মাঝেও আমি প্রতিনিয়ত খুঁজি আমার সেই বাংলা ভাষাকে, আমার বাংলাদেশকে। বোধহয় একেই বলে নাড়ির টান। দেহ থাকে যোজন যোজন দূরে, কিন্তু মনটা পড়ে থাকে সেই হাজার মাইল দূরের এক বদ্বীপের উঠোনে, যেখানে আমার প্রিয়জন হয়তো আমারই অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছেন।

ডোপামিন রাশ আর অদেখা সৌন্দর্যের টানে অপ্রত্যাশিত গন্তব্যে

জামিল শুভ ও তাসমিনা তাবাচ্ছুম - বিজিই'১৪

দেশ ছাড়ার আগের আমি আর আজকের আমি যেন সম্পূর্ণ দুজন ভিন্ন মানুষ। কারণ সেসময়ে যদি কেউ আমাকে বলত যে বাংলাদেশের পলিমাটিতে বেড়ে ওঠা আমি একদিন অনায়াসে লং হাইকের পরে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখব, তবে আমি হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিতাম। আমি সেই মানুষ যে নিজেকে কোনোদিন খেলোয়াড় বা স্পোর্টস পারসন মনে করিনি, বরং ওজনটাও একটু বেশির দিকে যাওয়ায় আরাম-আয়েশই ছিল জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু গত ত্রিশ মাসের স্মৃতির পাতা ওল্টালে আজ নিজেরই বিশ্বাস হতে চায় না যে সকল জীবন জীবীকার দৌড়ের বাইরেও এই কাজগুলো আমি করেছি। গত তিন বছরে আমি সাইকেলে পাড়ি দিয়েছি প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার পথ এবং সম্পন্ন করেছি একটি হাফ-ম্যারাথন, যা আমার মতো মানুষের জন্য স্বপ্নের চেয়েও বেশি কিছু ছিল। আর সবচেয়ে অবিশ্বাস্য হলো আমি এবং আমার স্ত্রী মুমু, আমরা হাইকিং করে পার করেছি ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি পাহাড়ি পথ, যার মধ্যে অন্তত ১০টি পাহাড় ছিল ১৪০০ মিটারেরও বেশি উঁচু। তবে এই পরিসংখ্যানের চেয়েও বড় অর্জন হলো আমাদের এই কঠিন যাত্রার সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য আমাদের মেয়ে এনোরা, যার বয়স এখন মাত্র দেড় বছর এবং সে আমাদের এই পুরো অভিযানের প্রতিটি ধাপের সাক্ষী। সমতল ভূমির মানুষ হয়ে যেখানে পাহাড়ের দেখা মেলাই ভার, সেখানে আমি কীভাবে পাহাড়ের প্রেমে পড়লাম? কেবল কি বিদেশের সুন্দর আবহাওয়া বা পরিবেশই এর কারণ, নাকি এর গভীরে কাজ করেছে আমাদের মস্তিষ্কের এক অদ্ভুত রসায়ন? তা ভাবলে অবাক হতে হয়। শুরুর দিকে এই কাজগুলো ছিল ভীষণ ক্লান্তিকর এবং আমার শরীর এই ধরণের ধকল নিতে একদমই প্রস্তুত ছিল না। চড়াই ভাঙতে গিয়ে দম ফুরিয়ে আসত আর মনে হতো কেন এসেছি এখানে।

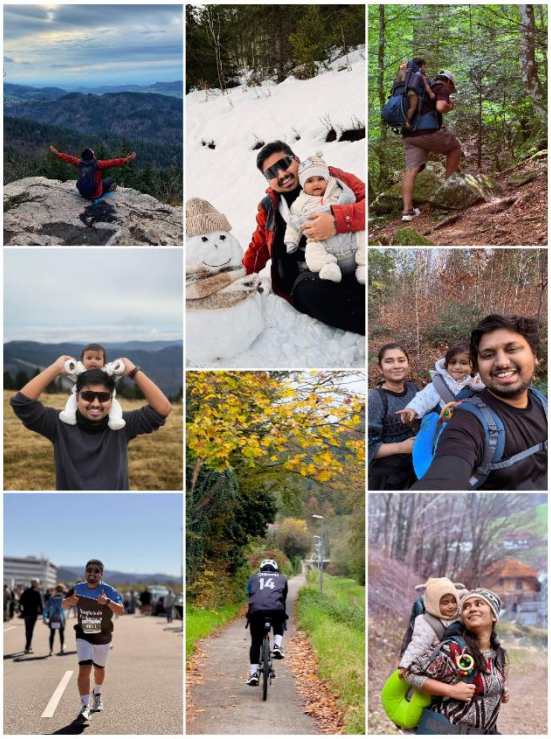

কিন্তু প্রতিটি লং রাইড বা খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানোর পর শরীর ব্যথা থাকা সত্ত্বেও মনের ভেতর এক অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করতাম এবং মনে হতো বিশাল কোনো রাজত্ব জয় করেছি। পরে পড়াশোনা করে জানলাম এটা কোনো জাদু নয়, বরং এটা হলো আমাদের মস্তিষ্কের 'নিউরো-কেমিস্ট্রি' বা স্নায়ু-রসায়নের এক নিপুণ খেলা। আমরা যখন দৌড়ানো বা সাইক্লিং কিংবা হাইকিংয়ের মতো কাজে শরীরকে দীর্ঘক্ষণ খাটাই, তখন আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের এক ধরণের পুরস্কার দেয়। কোনো কঠিন লক্ষ্য পূরণ করার সাথে সাথে মস্তিষ্ক 'ডোপামিন' নিঃসরণ করে, যাকে বলা হয় রিওয়ার্ড কেমিক্যাল বা পুরস্কারের হরমোন। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমি একটি লক্ষ্য স্থির করেছিলাম এবং শরীরের সবটুকু দিয়ে আমি সেটা করে দেখিয়েছি। আর এই ভালো লাগার তীব্র অনুভূতিটাই আমাদের

বারবার সেই কষ্টের পথে ফিরিয়ে আনে। তবে আসল ম্যাজিকটা ঘটে যখন ডোপামিনের সাথে এন্ডোরফিন আর এন্ডোক্যানাবিনয়েডস মিশে যায়। এন্ডোরফিন অনেকটা প্রাকৃতিক পেইনকিলার বা ব্যথানাশকের কাজ করে যা আমাদের দীর্ঘক্ষণের শারীরিক কষ্ট বা পেশির ব্যথা ভুলিয়ে দেয়। আর এন্ডোক্যানাবিনয়েডস মনের ভেতর গভীর প্রশান্তি আর উদ্বেগহীনতার জন্ম দেয়, যাকে ক্রীড়াবিদদের ভাষায় বলা হয় 'রানার্স হাই' বা দৌড়বিদের নেশা। আমি বুঝতে পারলাম আমি কেবল শারীরিকভাবে ফিট হচ্ছিলাম না, বরং আমি প্রাকৃতিকভাবেই এমন এক মানসিক প্রশান্তি পাচ্ছিলাম যা আমাকে বারবার প্রকৃতির কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের আধুনিক জীবনের স্ট্রেস বা দুশ্চিন্তা ভোলার জন্য এর চেয়ে ভালো ওষুধ আর নেই।

ইউরোপের এই ট্রেইলগুলোতে হাঁটতে হাঁটতে একটা বিষয় আমাকে খুব ভাবায়। চারপাশের এত হাইকার আর সাইক্লিস্টদের ভিড়ে আমি খুব কমই বাংলা ভাষা শুনতে পাই এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ এই ট্রেইলগুলোতে নেই বললেই চলে, অথচ অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে আমরা অনেকেই এখানে বেশ ভালো অবস্থানে আছি। একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমার মনে হয় এর কারণ আমাদের সাফল্যের সংজ্ঞার মধ্যে গভীরভাবে লুকিয়ে আছে। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় যে জীবনে একমাত্র দৌড় হলো পড়াশোনা আর ক্যারিয়ারের দৌড় এবং সাফল্য মানেই হলো ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া বা বড় চাকরি আর সুন্দর বাড়ি কিংবা মোটা অংকের ব্যাংক ব্যালেন্স। আমরা আমাদের সন্তানদের শেখাই যে নিরাপদ থাকাই হলো জীবনের সার্থকতা এবং আমরা পদোন্নতি বা পরীক্ষার রেজাল্ট থেকে পাওয়া ডোপামিনের পেছনে ছুটতে শিখি। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার আনন্দ যে ডোপামিন দিতে পারে তা আমাদের শেখানো হয় না। তাছাড়া আমাদের অবচেতন মনে কায়িক পরিশ্রম বিষয়টা এক ধরণের নিম্নবিত্তের কাজ হিসেবে গেঁথে আছে এবং আমরা ভাবি সারা জীবন পরিশ্রম করেছি যাতে একটু আরামে এসি রুমে বসে থাকতে পারি, তাই ছুটির দিনে শখ করে ঘাম ঝরানো বা পাহাড়ে চড়াটা অনেকের কাছেই বিলাসিতা বা বোকামি মনে হতে পারে। এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসাটা আমার জন্য শারীরিক পরিশ্রমের চেয়েও কঠিন ছিল। কিন্তু আমাকে বুঝতে হয়েছে যে শখ করে ঘাম ঝরানো বা পাহাড়ে চড়া কেবল কষ্ট নয়, বরং এটা মানসিক স্বাস্থ্যের এমন এক চাবিকাঠি যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না এবং নিজের শরীরকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যে যে গৌরব আছে তা অফিসের ডেস্কে বসে পাওয়া সম্ভব নয়।

গত আড়াই বছরে নিজেদের পরিবর্তনের সাথে সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো আমাদের এঞ্জেল এনোরার বেড়ে ওঠা দেখা। আমাদের এই যাত্রায় সে কখনোই বোঝা ছিল না বরং সে ছিল আমাদের অনুপ্রেরণা। ওর যখন মাত্র আড়াই মাস বয়স তখন থেকেই সে আমাদের হাইকিং সঙ্গী এবং তখন তাকে বুকের কাছে বেবি

ক্যারিয়ারে বেঁধে নিয়ে চলে যেতাম পাহাড়ে। আমার হাঁটার ছন্দে দোল খেতে খেতে সে পাহাড়ি পথেই ঘুমিয়ে পড়ত এবং তার কানের কাছে পাখির ডাক আর বাতাসের শব্দ ছিল তার ঘুমের গান। একটু বড় হওয়ার পর যখন তার ওজন বাড়ল তখন সে পিঠের হাইকিং ব্যাকপ্যাকে চড়া শুরু করল এবং তার দেখার জগতটা আরও বড় হলো। কথা ফোটার আগেই তার ছোট ছোট চোখ দিয়ে সে দেখেছে বিশাল সব পাহাড় আর গভীর উপত্যকা এবং সে রোদ, বৃষ্টি আর তুষারের সাথে পরিচিত হয়েছে খুব ছোটবেলাতেই। এখন তার বয়স দেড় বছর এবং সে এখন আর ব্যাকপ্যাকে বেশিক্ষণ বসে থাকতে চায় না বরং নামার জন্য ছটফট করে। আর পাহাড়ের ঢালু পথে যখন সে টলমলে পায়ে হাঁটে বা কোনো রঙিন পাথর আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে অবাক হয়ে দেখে, তখন একজন বাবা হিসেবে সেই দৃশ্য দেখার অনুভূতি কোনো ডোপামিন দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

আজ পেছনে ফিরে তাকালে এই ১৫০০ কিলোমিটার সাইক্লিং বা ২০০ কিলোমিটার হাইকিং, সবকিছু ছাপিয়ে আমার কাছে বড় অর্জন মনে হয় আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকে। আমি এখনো সেই সমতলের মানুষ আর আরাম-আয়েশ এখনো আমার প্রিয়, কিন্তু আমি শিখেছি যে পাহাড়ের চূড়ার দৃশ্য এবং সেখানে পৌঁছানোর অনুভূতি সব কষ্টের ঊর্ধ্বে। আমি শিখেছি যে সাফল্য মানে কেবল ব্যাংক ব্যালেন্স নয় বরং শরীর আর মনের সুস্থতাও এক বিশাল সাফল্য। আর সবচেয়ে বড় শান্তি হলো এটা ভাবা যে আমার মেয়ে এনোরার কাছে পাহাড় বা প্রকৃতি কোনো অচেনা জগত হবে না, বরং বড় হয়ে সে হয়তো তার বাবা মায়ের মতোই কোনো এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে আর ভাববে এই পৃথিবীটা কত সুন্দর। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

মোটাদাগের কথা

তৌহিদ আমানুল্লাহ, স্থাপত্য'৯১

বাক্যগুলো কি শুধুই কিছু শব্দের সমাহার?
না, এগুলোর ভেতরে অভিজ্ঞতা, সতর্কতা আর জীবনের শিক্ষা লুকিয়ে থাকে। পরিবর্তনের কথা বলতে গেলে আগে বোঝার চেষ্টা দরকার।
কিছু পরিচিত প্রবাদ ও তাদের ইঙ্গিত
১। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।
২। কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।
৩। শিকারী বিড়াল, গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।
৪। জ্ঞানের ভারে জ্ঞানীরা নত হয়ে থাকে।
৫। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
৬। বলদ যদি না বয় হাল, তার দুঃখ সর্বকাল।
৭। উন বর্ষায় দুননা শীত।
৮। পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল, তার দুঃখ হয় চিরকাল।
এই কথাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাস্তবতা বোঝা ছাড়া পরিবর্তনের কথা বলা অর্থহীন। তাই মোটা দাগে বলতে হয়

"আগে আইন ও আইনের শাসন (Law & Order),
পরে মত পোষণ "।

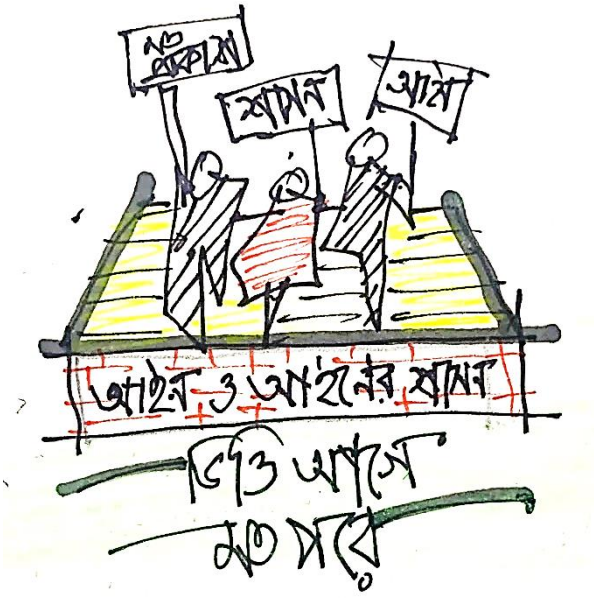

কেপ টাউনের দিনলিপি

জাকিয়া সুলতানা, ইস'০৯

কেপ টাউনে আসা আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমি এখানে এসেছি আমার পিএইচডি গবেষণার কাজের জন্য, এবং নভেম্বর ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত এই শহরে অবস্থান করছি। এই কয়েক মাস শুধু একাডেমিক কাজের সময় নয়, এটি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার, ভিন্ন বাস্তবতা বোঝার, এবং প্রকৃতি ও মানুষের বৈপরীত্য অনুভব করার একটি যাত্রা। এখানে কাটানো প্রতিটি দিন যেন আমাকে কিছু না কিছু শেখাচ্ছে।

টেবিল মাউন্টেন

শহরটিকে প্রথম দেখার অনুভূতি অভূতপূর্ব। দূরে টেবিল মাউন্টেন, যার চূড়া সত্যিই টেবিলের মতো সমতল, যেন শহরের উপর নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। এই পাহাড়টি ধীরে ধীরে আমার প্রতিদিনের দৃশ্যের অংশ হয়ে গেছে। কখনও সকালে আলোয়, কখনও সন্ধ্যার ছায়ায় - প্রতিবারই এটি নতুনভাবে ধরা দেয়। পাহাড়টির উপস্থিতি যেন এক ধরনের স্থিরতা দেয়, মনে করিয়ে দেয় আমি এক বিশেষ জায়গায় আছি।

এর পাশেই বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল, অসংখ্য সৈকত ছড়িয়ে আছে এখানে। এই সৈকতগুলোর সৌন্দর্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। নীল জল, সাদা বালি, দূরের পাহাড় সব মিলিয়ে এমন দৃশ্য তৈরি হয় যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তবে এই সৌন্দর্য সবসময় সহজভাবে উপভোগ করা যায় না। অনেক সময় প্রবল বাতাস বইতে থাকে; তখন সৈকতে দাঁড়ানোই কঠিন হয়ে পড়ে। বালি উড়ে আসে, ঠান্ডা বাতাস শরীর কাঁপিয়ে দেয়। তখন বুঝতে পারি প্রকৃতি এখানে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি শক্তিশালীও। এই অভিজ্ঞতা আমার কাছে কেপ টাউনের বাস্তবতার অংশ।

আমার সপ্তাহের দিনগুলো মূলত গবেষণার কাজে ব্যস্ত কাটে। ফিল্ডওয়ার্কের জন্য আমাকে কখনও কখনও যেতে হয় খায়েলিশা (Khayelitsha) তে, যেখানে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ বাস করে। এটি শহরের অন্যতম বৃহৎ টাউনশিপ। সেখানে যাওয়া সবসময় সহজ অনুভূতি নয়; কখনও ভয়ও লাগে। কিন্তু মানুষের জীবন, সংগ্রাম, এবং বাস্তবতা কাছ থেকে দেখা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এখানে এসে বুঝতে পারি, কেপ টাউনের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যের কঠিন বাস্তবতাও রয়েছে। এই বৈপরীত্য আমার গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিকেও সমৃদ্ধ করেছে।

সপ্তাহান্তের ভ্রমণগুলোর মধ্যে ক্যাম্পস বে আমার খুব প্রিয়। সাদা বালির সৈকত, একদিকে নীল সমুদ্র আর অন্যদিকে টেবিল মাউন্টেনের দৃশ্য এক অসাধারণ ভারসাম্য তৈরি করে। সেখানে বসে ঢেউয়ের শব্দ শুনতে শুনতে মনে হয় সময় যেন ধীরে চলছে। সূর্যাস্তের সময় আকাশের রং বদলে যাওয়া দেখলে মনে হয় প্রকৃতি নিজেই এক শিল্পকর্ম তৈরি করছে।

একদিন আমি গিয়েছিলাম হাউট বে যা অনেকটা বাংলাদেশী পতেঙ্গা বিচের কাছাকাছি, একদিকে পাথরের সারি অন্যদিকে টেবিল মাউন্টেনের অপরূপ দৃশ্য। কেপ টাউনের বিভিন্ন জায়গা থেকেই টেবিল মাউন্টেনের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়, যেন শহরের ব্যস্ততার বাইরে এক শান্ত পরিবেশ। এখানে

কয়েকটি জায়গা আছে যেখানে যাওয়ার পথে বিচ এবং টেবিল মাউন্টেনের অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়।

ক্যাম্পস বে

এখান থেকেই শুরু হয় চ্যাপম্যানস পিক ড্রাইভ, তাই হাউট বে ভ্রমণ যেন সেই রোমাঞ্চকর যাত্রার ভূমিকা ছিল। আঁকাবাঁকা পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরী এখানে, এক পাশে খাড়া পাহাড় আর অন্য পাশে গভীর সমুদ্র, এই পাহাড়ের উপর দিয়েই রাস্তা। এই দৃশ্যপট গাড়ি ভ্রমণকে শুধু যাত্রা নয়, বরং এক ধরনের অনুভূতিতে পরিণত করে। মাঝেমধ্যে থেমে দূরের দিগন্তের দিকে তাকালে মনে হয় পৃথিবীটা কত বিশাল।

হাউট বে

চ্যাপম্যানস পিক ড্রাইভ

বোল্ডার্স বিচ এ পেঙ্গুইন দেখা ছিল এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা যা পেঙ্গুইন দ্বীপ নাম পরিচিত। এই আফ্রিকান পেঙ্গুইনগুলোকে এত কাছ থেকে দেখা, তাদের হাঁটা বা পানিতে নামা সবই খুব জীবন্ত ও আকর্ষণীয়। প্রকৃতির সাথে এমন সরল সংযোগ তৈরি হওয়া মনকে প্রশান্ত করে। তবে এই পেঙ্গুইন গুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আছে মূলত পরিবেশ দূষণের কারণে তাদের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বোল্ডার্স বিচ বা পেঙ্গুইন দ্বীপ

একদিন ঘুরে আসলাম মুইজেনবার্গ বিচ-এ, এখানে রঙিন কাঠের ঘরগুলো সৈকতকে এক প্রাণবন্ত রূপ দিয়েছে। এখানে ঢেউ তুলনামূলক শান্ত, তাই সার্ফারদের দেখা যায়। আমি সেখানে হাঁটতে হাঁটতে মানুষের উচ্ছ্বাস আর সমুদ্রের প্রশান্তি দুটোই একসাথে অনুভব করেছি।

মুইজেনবার্গ বিচ

একইভাবে কাল্ক বে তে ছোট্ট বন্দর, মাছ ধরার নৌকা আর ক্যাফেগুলোর পরিবেশ খুব আন্তরিক লেগেছে। এখানে শহরের কোলাহল কম, বরং জীবনের এক ধীর ছন্দ দেখা যায়। তবে মধ্যাহ্নে এখানে রেস্তোরাগুলোতে দীর্ঘ লাইন দেখা যায়, সবাইকে খাবার অর্ডার করার পরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, এখানে মূলত বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের তৈরী খাবার পাওয়া যায়। একই সাথে কেউ তাজা মাছ কিনতে চাইলে এখন থেকে কিনতে পারে, একদিকে মাছ বিক্রি করতে দেখা যায়।

কাল্ক বে

ফিশ হুক সমুদ্র সৈকত আরও শান্ত, এখানে আটলান্টিক আর পাহাড়ের সারির মিলনস্থল, দুইদিকে পাহাড় আর মাঝে সমুদ্র। পাহাড়ের উপর ঘরবাড়ির অপূর্ব দৃশ্য একেবারেই ছবির মতো। বসে থাকলে মনে হয় নিজেকে নতুনভাবে গুছিয়ে নেওয়া যায়।

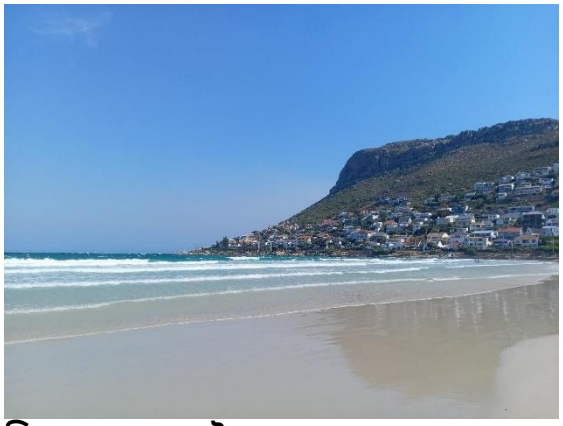

ফিশ হুক সমুদ্র সৈকত

এখানেই একদিন হঠাৎ ঘটেছিল একটি আনন্দময় ঘটনা - ন্যান্ডোস রেস্টুরেন্টে সৌরভ গাঙ্গুলীর সাথে দেখা। আমি তার নেতৃত্বের বড় ভক্ত, তাই তাকে সামনে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। তিনি এখন প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের কোচ, আর তার সাথে কথা বলতে পারা ও একটি সেলফি তোলা আমার জন্য বিশেষ স্মৃতি হয়ে থাকবে।

সিগন্যাল হিল এ যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই জায়গাটি সূর্যাস্ত দেখার জন্য বিখ্যাত, তাই একদিন আমি সেখানে গিয়েছিলাম শুধু সেই দৃশ্যটি দেখার জন্য। বিকেলের আলো ধীরে ধীরে নরম হয়ে

আসছিল, আর মানুষজনও জড়ো হচ্ছিল সাথে খাবার আর পানীয় নিয়ে সেই মুহূর্তটি উপভোগ করতে। আমি আমার ফোনের ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সামনে বিস্তৃত শহর আর দূরে লায়নস হেড মাউন্টেন আর পাশে আটলান্টিক। যখন সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তের সমুদ্রের মধ্যে নামতে শুরু করল, আকাশের রঙ বদলে গেল; কমলা, গোলাপি আর সোনালি আলোয় চারপাশ ভরে উঠল। আমি সেই মুহূর্তগুলো ক্যামেরায় ধরে রেখেছিলাম, টেবিল মাউন্টেনকে পেছনে ফ্রেমে রেখে ছবি তোলা আমার কাছে খুবই অর্থপূর্ণ মনে হয়েছে। সেই সময়টায় প্রকৃতি, আলো, পাহাড় আর সমুদ্র মিলে এক গভীর প্রশান্তি ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্য ডুবে যাওয়া দেখা আমার জন্য শুধু একটি সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করা নয় বরং নিজের সাথে একটু সময় কাটানোর মতো ছিল। সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই সবাই ফিরতে শুরু করলো। এই অভিজ্ঞতাটি কেপ টাউনে আমার ভ্রমণের অন্যতম প্রিয় স্মৃতি হয়ে থাকবে।

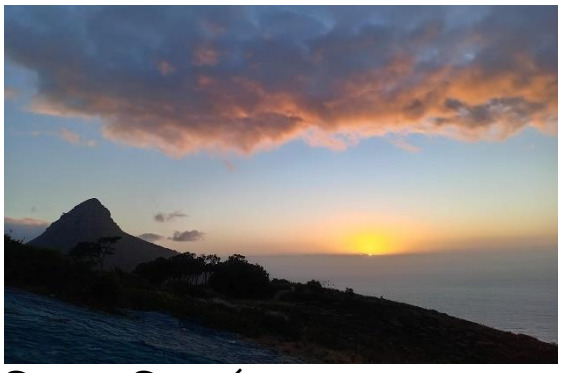

সিগন্যাল হিল সূর্যাস্ত

ওয়াটারফ্রন্টে গেলে মনে হয় শহরটি যেন তার সবচেয়ে প্রাণবন্ত রূপে ধরা দেয়। আটলান্টিকের ধারে হাঁটতে হাঁটতে ঠান্ডা বাতাস মুখে লাগে, দূরে নৌকা আর জাহাজের চলাচল দেখা যায়, আর চারপাশে মানুষের ভিড় শহরের সামাজিক স্পন্দনকে স্পষ্ট করে তোলে। প্রায়ই দেখা যায় রাস্তার শিল্পীরা গান গাইছে, বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে, আবার নাচও করছে। তাদের এই প্রাণবন্ত পরিবেশনা পুরো জায়গাটিকে এক উৎসবমুখর আবহ দেয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এখানে শিল্প ও বিনোদন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে।

ওয়াটারফ্রন্ট

এখানে আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো কেপ হুইল যা দেখতে অনেকটা লন্ডন আই এর মতো। বড় এই কেপ হুইল এর চাকা ধীরে ধীরে ঘোরে, আর ওপরে উঠলে পুরো ওয়াটারফ্রন্ট, সমুদ্র, আর আশপাশের শহরের দৃশ্য একসাথে দেখা যায়। এটিকে দেখলেই জায়গাটির আধুনিক ও পর্যটনকেন্দ্রিক দিকটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এমন একটি স্থাপনা শহরের আন্তর্জাতিক চরিত্রকেও তুলে ধরে।

কেপ হুইল

মানুষের ভিড়ও এখানে দেখার মতো - পরিবার, পর্যটক, বন্ধু, সবাই যেন নিজেদের মতো করে

সময় কাটাচ্ছে। কেউ ছবি তুলছে, কেউ কেনাকাটা করছে, কেউ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সন্ধ্যার পর আলো জ্বলে উঠলে জায়গাটি আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে - রেস্টুরেন্ট, দোকান, আলো আর সুর মিলিয়ে এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়।

কেপ টাউনে আমার থাকার জায়গাটি হলো বো-কাপ (Bo-Kaap) এলাকা যা তার রঙিন বাড়িগুলোর জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। এটি কেবল থাকার জায়গা নয় এক ধরনের অনুভূতির অংশ হয়ে উঠেছে। বো-কাপের সরু পাথুরে রাস্তা ধরে হাঁটলেই চোখে পড়ে একের পর এক উজ্জ্বল রঙের বাড়ি - গোলাপি, নীল, সবুজ, হলুদ, বেগুনি। প্রতিটি বাড়ি যেন নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকালের আলোয় এই রংগুলো কোমল লাগে, আর বিকেলের সূর্যাস্তের সময় এগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কখনও কখনও মনে হয় আমি যেন এক শিল্পীর আঁকা ছবির মধ্যে বাস করছি।

বো-কাপ (Bo-Kaap) এলাকা

বো-কাপকে ইতালির ভেনিসের বিখ্যাত বুরানো দ্বীপের (Burano Island) সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ সেখানেও রঙিন বাড়ির সারি রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে বো-কাপ আরও বেশি প্রাণবন্ত, আরও গভীর অর্থবহ। এখানে শুধু রঙিন বাড়ি নয় আছে ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং মানুষের গল্প। এই এলাকাটি মূলত কেপ মালয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য বহন করে, এবং সেই ঐতিহ্য আজও এখানে জীবন্ত।

এখানের অধিকাংশসহ পরিবার মুসলিম। মসজিদের আজান, ছোট ক্যাফে, স্থানীয় মানুষের হাসিমুখ সব মিলিয়ে বো-কাপ শুধু একটি পর্যটনকেন্দ্র নয়, এটি একটি জীবন্ত সম্প্রদায়। আমি থাকি পাহাড়ের একেবারেই উপরে যেখান থেকে চারিদিকে মনোরম সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়, বাসার ছাদ থেকে একদিকে দূরের টেবিল মাউন্টেন দেখা যায়, তার কাছেই লায়নস হেড যেটি আরেকটি মাউন্টেন, অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, মাঝে মাঝে রয়েছে পাহাড়ের উপরে সারি সারি বাড়ি এবং কেপ টাউন শহর। সন্ধ্যায় পাহাড়ের পটভূমিতে রঙিন বাড়িগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান যে এই জায়গাটিকে কয়েক মাসের জন্য নিজের ঠিকানা বলতে পারছি।

যেসব জায়গায় যাওয়ার অপেক্ষায়:

এখনও কিছু জায়গা বাকি আছে, যেগুলো দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। কেপ পয়েন্ট এমন একটি স্থান যেখানে সমুদ্র আর পাহাড়ের মিলন ঘটে নাটকীয়ভাবে। খাড়া ক্লিফ, বাতিঘর আর বিস্তৃত দিগন্ত - সেখানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির বিশালতা অনুভব করার আশা করছি।

আকুইলা সাফারি আমাকে অন্যরকম উত্তেজনা দিচ্ছে। শহরের বাইরে প্রকৃতির মাঝে বন্যপ্রাণী সিংহ, হাতি বা অন্যান্য প্রাণী তাদের নিজস্ব পরিবেশে দেখা আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা হবে। এটি শুধু ভ্রমণ নয়, বরং প্রকৃতির প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করবে বলে মনে করি।

আর রোবেন আইল্যান্ড আমার কাছে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ। এখানেই দক্ষিণ আফ্রিকার মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে বহু বছর কারাগারে রাখা হয়েছিল। সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ানো মানে ইতিহাসের এক কঠিন অধ্যায়ের সামনে দাঁড়ানো। এটি শুধুমাত্র

একটি দর্শনীয় স্থান নয় - বরং মানুষের দৃঢ়তা ও আশার প্রতীক।

সব মিলিয়ে, কেপ টাউনে আমার সময় কাটছে কাজ আর ভ্রমণের সুন্দর সমন্বয়ে। সপ্তাহের দিনগুলোতে গবেষণার কাজ আর সপ্তাহান্তে শহরটিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা, এই অভিজ্ঞতা আমাকে শুধু একজন গবেষক হিসেবেই নয়, একজন মানুষ হিসেবেও সমৃদ্ধ করছে। আমি জানি, এই স্মৃতিগুলো আমার জীবনের দীর্ঘ পথচলায় বিশেষভাবে থেকে যাবে।

নুমাহ। তৌহিদ, স্থাপত্য'৯১ এবং তিতিয়া, স্থাপত্য'৯১

আমাদের মহল্লা

মফিজ, ইএস'০০

প্রবাসী খুবিয়ানদের একুশে ফেব্রুয়ারি উপযাপনে এ লেখা কতটা প্রাসঙ্গিক হবে জানি না, তবু লিখছি। কারণ আমরা সবাই মহল্লায়, হল্লা করতে করতেই বড় হয়েছি। আমাদের শৈশব আর কৈশর জুড়ে রয়েছে পাড়া আর মহল্লার স্মৃতি। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ যা হারিয়েছে, তার দীর্ঘ তালিকায় মহল্লা-সংস্কৃতি হারানোর দুঃখই আমার কাছে সবচেয়ে বিষাদময়।

আমাদের গলির মোড়ে চৌকোনা কাঠের ফ্রেমে সকাল হতে না হতেই খবরের কাগজ সেটে দেওয়া হতো। কিছু বেকার মন দিয়ে পড়ত চাকরির বিজ্ঞাপন, ছোট্ট নোটবুক বের করে টুকে নিত প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর। কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গেলে কিংবা ভালো ফলাফল করলে তার বাবা-মার ছবিসহ গল্প ছাপা হতো পত্রিকায়। আমাদের বাবা-চাচাদের স্বপ্ন ছিল, ছেলে-মেয়েদের ছবি ছাপা হোক সেইসব খবরের কাগজে।

গলির মোড়েই ছিল একটা চায়ের দোকান। ডুবো তেলে মুন্সি চাচা আলু আর ডালপুরি ভাজতেন। তখন চিনি বিহীন চায়ের প্রচলন ছিল কম। হয়তো ডায়াবেটিস তখনো আমাদের মহল্লায় জেকে বসেনি। আমরা চায়ের ভেতর আদা নয়তো লেবু ফেলে চুমুক দিতাম। পকেটে টাকা কম থাকলে একটা চা দুটো করে ভাগ করে খাবার রেওয়াজ ছিলো । শীতের রাতে আমার চা লম্বা করে খেতাম আর কাশীর সিরাপ খাবার পর খেতাম মালাই চা। যশোরে তখন কাশি না হলেও কাশির সিরাপ খাওয়া তেমন দৃষ্টিকটু ছিলোনা। তখনো বয়সের বিভাজন ছিল সুস্পষ্ট। পারতপক্ষে আমরা মুরুব্বিদের মুখোমুখি হতাম না। সিগারেট খেতে যেতাম কলেজের দেয়ালের ওপারে। সেগারেট খেয়ে চুইংগাম চিবোতে চিবোতে ঘরে ফিরতাম, যেন গন্ধ লুকানো যায়।

মহল্লায় ফি বছর পিকনিক হতো। হিন্দি আর উর্দু গান বাজত। হিন্দী সিনেমার বদৌলতে আমরা হিন্দী আর উর্দুতে পারদর্শী ছিলাম । বাঁশের এন্টেনা ঘুরালেই দেখতে পেতাম দূরদর্শন । শীতের সকালে সোয়েটার আর চাদর গায়ে আমরা পিকনিকে যেতাম। বাসের ছাদে ডেগের সঙ্গে ঢুলতে ঢুলতে যেত বাবুর্চি। মানুষ বেশি হলে পোলাওতে বেশি ডালডা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল-যেন সবাই কম খেতে পারে, খাবারে ঘাটতি না পড়ে। পিকনিকের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই ছিল তরুণ-তরুণীদের পরিচিত হবার সুযোগ। আমি বহুবার কবিতা পড়েছি মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কিন্তু সেই দৃষ্টি থাকতো সানগ্লাসে মোড়া।

মহল্লায় আমরা সবাই সবাইকে চিনতাম। প্রতিবেশিদের বাসা বদলাতে সাহায্য করতাম। রিকশা ডেকে দিতাম। বিশেষ করে বড় আপাদের। তাদের দেখলেই মনে হত আমরা এত ছোট কেন? কবে বড় হবো নাদের আলী।

কবে আমাদের গোঁফ গজাবে । শীতের সন্ধ্যায় লাইট জ্বালিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলতাম। ভাবীদের ভারী ব্যাগ বাসায় পৌঁছে দিতাম; সেই ফাঁকে কথা হয়ে যেত দীপ্তি, বৃষ্টি বা লাবণ্যদের সঙ্গে।আমাদের মহল্লায় তখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন ছিল না।

আমরা ম্যাকগাইভার দেখতে যেতাম অন্যের বাসায়। সেখানেই প্রথম প্রেম । ফাইনাল পরীক্ষা শেষে নিজেরা টাকা জমিয়ে সিনেমা দেখার জন্য ভিসিআর ভাড়া করতাম। জুহি চাওলা আর মাধুরী দীক্ষিতকে দেখতে দেখতে, কুয়াশায় ভিজে কাশি বাধিয়ে ঘরে ফিরতাম।

আমাদের মহল্লায় খুদে মাস্তানও ছিল কিছু। ফেনসিডিলে চুমুক দিয়ে তারা হিন্দি গান গাইত। মাজায় গোজা থাকত সেভেন গিয়ার। আমারও শখ ছিল ছেঁড়া জিন্স পরে মাস্তান হওয়ার।এইম ইন লাইফ ছিলো মাস্তান হবো কিন্তু হয়েছি ছাপোষা চাকুরীজীবী ।

আমাদের বিকেলগুলো কাটতো ছাদে। নীলা কাপর শুকাতে দিতে আসত। তাকে দেখতে নীল আকাশের মতো লাগত। কলেজ পেরোতে না পেরোতেই মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল। চিঠি লেখার জন্য রেখে গেল আকাশের ঠিকানা। এখনো বার্লিনের মেঘমুক্ত নীল আকাশের দিকে তাকালে নীলাকে মনে পড়ে । জানি তুমি এ লেখা পড়বে না কারন তুমি মিশে গেছো আকাশের নীলে।

বার্লিনের চিঠি
২০ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বার্লিন, জার্মানি

বিদায় প্রেয়সী

তানভীর, অর্থনীতি'০১

আচ্ছা, যেদিন আমি চলে যাবো-
সেদিন তুমি আসবে তো?
সেই হলুদ শাড়ী নীল টিপ,
খোঁপায় লাল গোলাপ,
কালো কাজলে তোমার টানা চোখ-
রাঙাবে তো!
আচ্ছা, আমি যেদিন নিস্তব্দ হবো-
সেদিন তুমি কাঁদবে তো?
তোমার কাজল ভেজা চোখের জল,
আর তোমার খোঁপার ফুলে-
আমার সমাধি সজ্জিত কোরো।
সেদিন বলতে পারবো না কিছুই,
শুধু নীরব চোখে তাকিয়ে রবো।
সে চোখে পড়ে নিও আমার-
না বলা ভালোবাসা।
সুযোগ হলে তোমার-
শরীরের গন্ধ মাখিয়ে দিও-
আমার সাদা কাপড়ে।
সে গন্ধেই আমি খুঁজে নিবো তোমায়-
আমার ওপারের জীবনে।
শুধু মনে রেখো-
প্রেয়সী তো সবসময়েরই রাণী।

শিশু ওম

মিঠুন কুমার সমাদ্দার, এটি'০৫

গাছের পাতা ছন্দে দোলা তোতা বৃষ্টিতে ভিজে গেলে। ইমন রাগ পাখি হয়ে নামিয়ে আনে। অন্ধকার। একটু দেরীতে আসা সন্ধ্যা। চক্রাকারে তার আচল তলে হালকা চালে। সেইটুকুই দেখায় যেটুকু দেখানো যায়। বাকিটা নিজের। সাক্ষর করা দুঃখ। শোল মাছের লেজের শব্দ জল শুষে নিলে। বন্যা তার নাম। একটু উপরে ওঠে! রাত ফনা তোলে।

সময় মায়ার মত মসৃণ পথে কেবল নিচে যায়। ঘুমের মধ্যে তাই। কেবল দোলা লাগে। যতদূর চাও নিচে গিয়ে পড়। ভাবনা তো নেই। দুর্ঘটনা সেই হাতের উপরে কালের মাথা। বাতাসে ভেজা পাখির গায়ের ঘ্রাণ। ঘোলাটে আকাশে ধেনো মদের মত মেঘ গেলা দৃশ্য। মায়ের গন্ধ হয় এমন একটা গান গাও; বাইক্কা বিলের পাখি। প্রতিটি মুহুর্ত মায়া প্রতিটি মুহুর্ত অতীত। একটার গায়ের উপরে আরেকটা শুয়ে সময় ওম শিশু হয়ে যায়।
১১.০১.২০২৫

নিঘুমে ডিঙি নৌকা

মিঠুন কুমার সমাদ্দার, এটি'০৫

আমাদের ছবির উত্তরসূরী কম্পনসার ডিঙি নৌকা। পুরোনো নদী ডেকে আনে শৈশব সাতারের ঘ্রাণ। এমন আচমন মাখা জল। গড়িয়ে আনে পূজার ফুল। বার বার একই বাক্য স্তোস্ত্রগীত। শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়া ব্রাম্মণের মতি ভ্রমের মত। পুরোনো স্কুল। এই খাদে শখের সাতু। ফাটল বেরিয়ে দেখায়।

যা বুনি তার চারা বের হয় না। কেবল একাদশ সাজাই। আশার ক্যাপ্টেন। পাখিদের ওমের সূত্র। শীতের বাহির ঘর যার। বাঙলা অভিধানের বড় হয়ে ওঠা জীবন চক্রপাল। একই রেখায় মিশে গেলে। আরেকটা সফল কবিতার অপমৃত্যু হয়। ক্রিয়াপদে কেবলই মায়া; ক্রিয়াশীল প্রেমিকসত্তা শক্তিশালী।
১১.০১.২০২৫

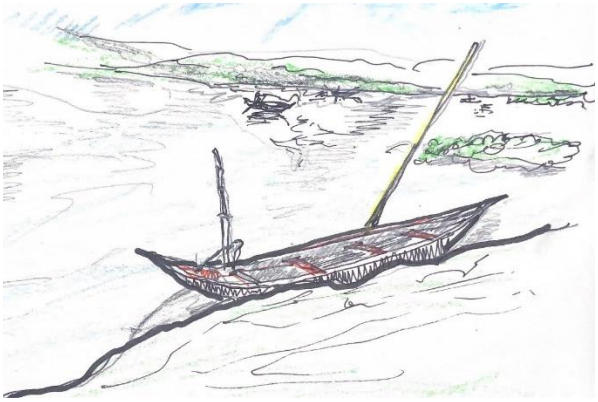

অব-দংশ

মিঠুন কুমার সমাদ্দার, এটি'০৫

মানিপ্লান্ট ব্যথা বুকের বা পাশে অর্থ হয়ে যাও। মাঝের কিছু সময় হাফটাইম কনসার্ট। আমার নাচানাচি সেরা খেলয়াড়কে বিভ্রান্ত করে। ফুলের রঙের টব জল শুন্য হয়ে কর কীর্তন। ঝনঝন বা অপমৃত্যু। ছন্দের এবং নৃত্যের। চোখ সামনে নজর পিছনে। প্লাসে মেয়ে মাইনাসে ছেলে। অবচ্ছেদে আতুড়ঘর সেজে আবার মায়ের মুখ। মহুয়া হয়ে যাও।

প্রান্তরে ঘাস। আমার ভিতরের একশো ছাগ শিশু ক্ষুধা। উপেক্ষা করে একের পর এক খেলাঘর। একের পর এক অনুভুতি শুন্য বাক্য। ভীড়ের মধ্যে খলবল করে গজার মাছ যেন। নিজস্ব ভাষা বা বিবমিষা। হতেই পারে। তাই নিয়ম করে জল পান। পানির তৃষ্ণা বাড়ায়। স্পষ্ট জ্ঞানের অন্তরালে অবস্থিত অস্পষ্ট চেতনা। আগুন করে ফেলো সব দেবশিশুদের।
১১.০১.২০২৫

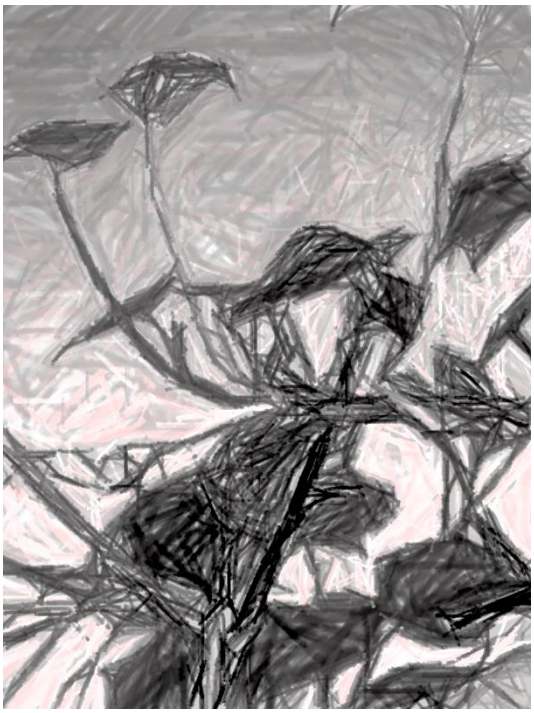

জার্মানির তিন বাঙালি বীর

শুভ, নগ্রাপ'৯৪

শুরুর গল্প

জার্মানির এক ছোট শহর-ধরা যাক নাম হানসেনডর্ফ-সেখানে তিনজন বাঙালি বাস করত। নাম তাদের যথাক্রমে পোচু, কচু আর মচু। তিনজনের নাম শুনে জার্মানরা প্রথমে ভেবেছিল এটা হয়তো কোনো সবজির পাইকারি ব্যবসা। কিন্তু না, এরা ছিল রীতিমতো উচ্চশিক্ষিত, উচ্চস্বরে তর্কপ্রিয়, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালি।

তিনজনই বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করতে এসে জার্মানিতে থেকে গেছে। কিন্তু তাদের জীবনদর্শন তিন রকম।

- পোচু বাংলাদেশি রাজনীতির অঘোষিত ইউরোপ শাখার চেয়ারম্যান।
- কচু ইউরোপে টাকাই ধর্ম, বাকিটা সব গৌণ।
- মচু "সামাজিক কল্যাণ" শব্দটা শুনলে চোখে পানি আসে।

তারা একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এক সপ্তাহ দেখা না হলে বুকের ভেতর ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

আর আমি? আমি এই তিন মহারথীর সাথে পরিচিত হওয়ার পর শিখেছি ইউরোপে টিকে থাকতে হলে শুধু টাকা বা রাজনীতি না, বন্ধুত্বও দরকার। আর একটু পাগলামি।

পোচু প্রতিদিন সকাল ৬টায় ওঠে। কারণ জার্মান সময়ে সকাল ৬টা মানে বাংলাদেশে সকাল ১০টা। অর্থাৎ রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রাইম টাইম। তার ফোনে ৪৭টা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ।

- "বাংলাদেশ রিফর্ম ফোরাম জার্মানি"
- "দেশ বাঁচাও ইউরোপ শাখা"
- "গ্লোবাল পরিবর্তন মুভমেন্ট"
- "আমরা ছাড়বো না"

সে প্রতিদিন ফেসবুকে তিনটা স্ট্যাটাস দেয়

১. বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্লেষণ

২. কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ

৩. নিজের লাইভের লিংক

একদিন দেখি সে খুব উত্তেজিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

"কি হইছে?"

সে বলল, "আজকে আমি ইউরোপ থেকে আন্দোলন ডাকছি।"

"কোথায়?"

"ফেসবুকে।"

পোচু কখনো ভোট দেয় না জার্মানিতে। কিন্তু বাংলাদেশে ভোট হলে সে তিনদিন না খেয়ে আলোচনা করতে পারে।

কচু একদিন বলেছিল,

"দোস্ত, তুই জার্মানিতে থাকিস। জার্মান ট্যাক্স দিস। জার্মানিতে ভোট দে।"

পোচু বলেছিল, "আমি আন্তর্জাতিক নাগরিক!"

মচু বলেছিল, "আন্তর্জাতিক নাগরিক হয়ে ভাড়া সময়মতো দিস না কেন?"

পোচু তখন তিনদিন কথা বলেনি।

কচুর জীবনদর্শন একটাই "ইউরো মানে স্বাধীনতা।"

সে একসাথে তিনটা পার্ট-টাইম করে, দুইটা স্টার্টআপ আইডিয়া নিয়ে ঘোরে, আর পাঁচটা ইউটিউব ভিডিও দেখে "Passive Income in Germany" ।

সে সবসময় বলে, "দেখ, আমরা এখানে এসেছি সেটল হতে। টাকা না থাকলে সম্মান নাই।"

একদিন দেখি সে উত্তেজিত, "আমি নতুন ব্যবসা শুরু করবো।"

"কি?"

"বাংলাদেশি ফুচকা ট্রাক।"

পোচু বলল, "এইটা জাতীয় সংস্কৃতি বিক্রি!"

মচু বলল, "ফুচকার আয় থেকে কত শতাংশ সমাজসেবায় দিবি?"

কচু দুইজনের দিকে তাকিয়ে বলল, “তোরা দুইজনই ব্যবসার শত্রু।”

কচু হিসাব করে মাসে কত ইউরো সেভ, কত বিনিয়োগ, কত ট্যাক্স রিফান্ড ।

কিন্তু সে কখনো হিসাব করে না কতটা হাসি জমা হচ্ছে জীবনে।

মচু কাজ করে একটি এনজিওতে। তার লক্ষ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো।

সে সবসময় বলে, “আমাদের দায়িত্ব আছে।”

কিসের দায়িত্ব?

সবকিছুর। নতুন স্টুডেন্ট এলে এয়ারপোর্টে রিসিভ, কেউ বাসা না পেলে সোফা দাও, কেউ কাঁদলে মনোবল দাও, কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতাল নিয়ে যাও.. ..

কচু বলে, “তুই না থাকলে জার্মানি ভেঙে পড়ত।”

পোচু বলে, “তুই আমার আন্দোলনে আসিস না কেন?”

মচু শান্তভাবে বলে, “তোদের দুজনকে বাঁচানোই আমার আন্দোলন।”

তিনজন একসাথে বসলে আলোচনা শুরু হয় এভাবে

পোচু: “দেশের অবস্থা খারাপ।”

কচু: “তোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অবস্থা খারাপ।”

মচু: “তোমরা কেউ মেডিটেশন করো না কেন?”

একদিন তো রীতিমতো মারামারি লেগে যাচ্ছিল। কারণ?

পোচু বলেছিল, “রাজনীতি না বুঝলে মানুষ হওয়া যায় না।”

কচু বলেছিল, “টাকা না থাকলে মানুষ টিকে না।”

মচু বলেছিল, “মানুষ না হলে টাকা আর রাজনীতি দুইটাই বৃথা।”

তিনজন তিনদিকে চলে গেল। এক সপ্তাহ তারা কেউ কারও সাথে কথা বলল না।

পোচু লাইভ করল একা। কচু ব্যবসার প্ল্যান করল একা। মচু সমাজসেবা করল একা।

কিন্তু সমস্যা হলো

- পোচুর লাইভে কেউ কমেন্ট করছিল না। কারণ কচু সবসময় প্রথম কমেন্ট দিত “সত্য কথা বলছিস ভাই।”
- কচুর ব্যবসা আইডিয়ায় কেউ বাস্তবতা চেক দিচ্ছিল না।
- মচুর ইভেন্টে কেউ হাসি-ঠাট্টা করছিল না।

তারা বুঝল তারা একে অন্যকে সহ্য করতে না পারলেও একে অন্যকে দরকার।

আমি প্রথম যখন তাদের সাথে পরিচিত হই, ভাবছিলাম এরা তিনজন পাগল।

কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝলাম, পোচু আমাকে শিখিয়েছে দেশকে ভুলে গেলে নিজের শিকড় হারিয়ে যায়। কচু শিখিয়েছে আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া প্রবাসে সম্মান টেকে না। মচু শিখিয়েছে মানুষের পাশে না থাকলে প্রবাস জীবন শূন্য।

আশার প্রথম অধ্যায়

জার্মানির শীত তখন চরমে। বাইরে তুষার, ভেতরে হিটার, আর পোচুর মাথায় আগুন।

একদিন রাত ২টায় সে আমাদের গ্রুপে মেসেজ দিল “আমি নির্বাচন করবো।”

কচু রিপ্লাই দিল ৩ মিনিট পর “কোনটা? জার্মানির নাকি বাংলাদেশের?”

পোচু লিখল “বাংলাদেশ। প্রবাসী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে।”

মচু শুধু একটা ইমোজি দিল

সকালে দেখা গেল পোচু সত্যি সত্যি একটা পোস্টার বানিয়েছে

“পরিবর্তনের প্রতীক”

সে ঘোষণা দিল, “আমি অনলাইন ক্যাম্পেইন চালাবো। ইউরোপ থেকে সুশাসন।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তোর ভোটার কারা?”

সে বলল, “যারা সচেতন।”

কচু বলল, “মানে ১৭ জন?” পোচু রাগে দুইদিন কথা বলেনি।

এইদিকে কচু নতুন এক জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সি।

সে প্রতিদিন বলে, “ভাই, এটা ভবিষ্যৎ। ব্লকচেইন বুঝলে জীবন বদলে যাবে।”

মচু বলল, “তুই আগে নিজের লাইফ চেইন ঠিক কর।”

কচু ইউটিউব দেখে, টেলিগ্রাম গ্রুপে ঢুকে, চার্ট দেখে বলে “এই কয়েনটা উঠবে।”

একদিন সে ঘোষণা দিল, “আমি নতুন টোকেন লঞ্চ করবো BanglaCoin।”

পোচু সঙ্গে সঙ্গে বলল, “এইটা জাতীয় সম্পদ!”

মচু বলল, “এই কয়েনের লাভ দিয়ে সমাজসেবা করবি তো?”

কচু মাথা চুলকে বলল, “আগে লাভ হোক।”

মচু এদিকে নতুন মিশনে।

সে বলল, “আমরা প্রবাসী ছাত্রদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সাপোর্ট গ্রুপ বানাবো।”

পোচু বলল, “ওখানে আমি রাজনৈতিক সচেতনতা সেশন নিতে পারি।”

কচু বলল, “আমি ফাইন্যান্স ওয়ার্কশপ নিতে পারি কিভাবে টিকে থাকবে।”

মচু বলল, “না, আগে মানুষ বাঁচুক।”

সে এক সন্ধ্যায় কমিউনিটি সেন্টারে লিখে টাঙালো

“কাঁদতে ইচ্ছা করলে এখানে আসুন।”

প্রথম দিন কেউ আসেনি। দ্বিতীয় দিন একজন এল। তৃতীয় দিন ৮ জন।

মচু চুপচাপ বসে শোনে। কোনো বক্তৃতা দেয় না। শুধু বলে “তুমি একা না।”

সমস্যা শুরু হলো যখন তিনজন একই দিনে ইভেন্ট রাখতে চাইল।

- পোচুর রাজনৈতিক লাইভ
- কচুর ক্রিপ্টো সেমিনার
- মচুর সাপোর্ট গ্রুপ

একই হল, একই সময়।

তর্ক শুরু।

পোচু: “দেশ আগে।”

কচু: “টাকা আগে।”

মচু: “মানুষ আগে।”

তিনজন এত চিৎকার করছিল যে পাশের জার্মান প্রতিবেশী এসে বলল “Alles okay?”

তিনজন একসাথে বলল, “Yes!”

প্রতিবেশী চলে গেল। তিনজন চুপ।

হঠাৎ ধাক্কায় এলোমেলো

একদিন কচুর BanglaCoin হঠাৎ দাম হারালো।

সে চুপচাপ বসে ছিল।

পোচুর অনলাইন নির্বাচনেও কেউ সিরিয়াস নেয়নি। কমেন্টে সবাই লিখেছে “ভাই, আগে জার্মান ভাষা শিখেন।”

মচুর সাপোর্ট গ্রুপে লোক বাড়ছে, কিন্তু সে নিজেই ক্লান্ত।

সেদিন প্রথমবার তিনজন একসাথে চুপচাপ বসে ছিল। কেউ কারও সাথে তর্ক করেনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোরা আসলে কি চাস?"

পোচু বলল, "আমি চাই আমাদের দেশের মানুষ ভালো থাকুক। আর আমরা যেন লজ্জা না পাই নিজেদের পরিচয়ে।"

কচু বলল, "আমি চাই আমরা নিরাপদ থাকি। টাকা থাকলে অন্তত ভয় কম থাকে।"

মচু বলল, "আমি চাই কেউ একা না থাকুক।"

আমি হাসলাম, বললাম "তোরা তিনজন আলাদা না। তোরা একই গল্পের তিনটা অধ্যায়।"

আবার স্বপ্নের শুরু

তারা সিদ্ধান্ত নিল

- পোচু রাজনীতি করবে, কিন্তু তথ্য যাচাই করে।
- কচু ব্যবসা করবে, কিন্তু লোভ কমিয়ে।
- মচু সমাজসেবা করবে, কিন্তু নিজের বিশ্রামও নেবে।

তারা মিলে নতুন প্রোগ্রাম শুরু করল, "দেশ, টাকা, মানুষ" প্রবাসীদের জন্য একত্রিত প্ল্যাটফর্ম।

সেখানে ক্যারিয়ার আলোচনা, নাগরিক সচেতনতা, মানসিক স্বাস্থ্য সেশন, ফান্ডিং ট্রেনিং হয় ।

তিনজন আবার ঝগড়া করে। আবার হাসে। আবার রাগ করে। আবার একসাথে খায়।

একদিন বরফ পড়ছে।

পোচু বলল "একদিন আমি দেশে ফিরবো।"

কচু বলল "আমি এখানে বাড়ি কিনবো।"

মচু বলল "আমি যেখানে মানুষ আছে, সেখানেই থাকবো।"

আমি ভাবলাম প্রবাস জীবন মানে দ্বন্দ্ব। ফিরবো নাকি থাকবো? টাকা নাকি আদর্শ? নিজে বাঁচবো নাকি সবাইকে নিয়ে? পোচু আমাকে শিখিয়েছে শিকড় ভুলে গেলে মানুষ ফাঁকা হয়। কচু শিখিয়েছে হিসাব না জানলে প্রবাস কঠিন।

মচু শিখিয়েছে সহানুভূতি ছাড়া সবকিছু নিষ্ঠুর।

তিনজন একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ছাড়া থাকতে পারে না। হয়তো এটাই আমাদের ইউরোপের গল্প।

হঠাৎ শিকড়ের টান

এক সকালে পোচু ঘোষণা দিল "আমি দেশে ফিরতেছি।"

আমরা ভেবেছিলাম আবার কোনো অনলাইন আন্দোলন।

কিন্তু না। সে সত্যি সত্যি টিকিট কেটে ফেলেছে।

কারণ?

"দেশ আমাকে ডাকছে।"

কচু হিসাব করল "রিটার্ন টিকিট কেটেছিস?"

পোচু গলা উঁচু করল "আমি ফিরবো স্থায়ীভাবে!"

মচু চুপচাপ জিজ্ঞেস করল "তোর জার্মান রেসিডেন্স পারমিট?"

পোচু একটু থামল। "আছে তো... মানে... এক্সটেনশন লাগবে।" তবু সে গেল।

ফেসবুকে পোস্ট দিল "প্রবাস ছেড়ে মাটির টানে ফিরে যাচ্ছি।" কমেন্টে ৫৬৭টা "গর্বিত ভাই" ।

দুই সপ্তাহ পর ভিডিও কল।

পোচু ঘামছে। "এই গরমে মানুষ থাকে কেমনে?"

আরেকদিন "ইন্টারনেট ক্যান এমন?"

আরেকদিন "এখানে সবাই রাজনীতি করে, কিন্তু কেউ শোনে না!"

সে বুঝল, ফেসবুকের রাজনীতি আর বাস্তব রাজনীতি আলাদা জিনিস।

এক মাস পর সে বলল "আমি দুই জায়গাতেই কাজ করবো। দেশেও, জার্মানিতেও।"

কচু হাসল “মানে দুইদিকেই ফেসবুক লাইভ?”
এদিকে কচুর অবস্থা খারাপ। BanglaCoin ধ্বংস। স্টার্টআপ ব্যর্থ। নতুন বিনিয়োগে লোকসান।
সে বলল “আমি শেষ।”
পোচু ভিডিও কলে বলল “সংগ্রাম ছাড়া সাফল্য আসে না!”
কচু বলল “তুই তো সংগ্রাম করিস অনলাইনে!”
মচু পাশে বসে ছিল। চুপচাপ কফি এগিয়ে দিল।
বলল “দেউলিয়া মানে শেষ না। এটা রিসেট।”
কচু প্রথমবার কাঁদল। বলল “আমি শুধু টাকা দেখছিলাম। জীবন দেখিনি।”
ঠিক তখনই বোমা ফাটাল মচু। “আমি বিয়ে করবো।”
আমরা দুইজন চমকে উঠলাম।
পোচু বলল, “কে? কবে? কিভাবে?”
কচু বলল, “বাজেট কত?”
মচু হেসে বলল, “সে-ও সমাজসেবায় কাজ করে। আমরা একসাথে কমিউনিটি প্রজেক্ট করবো।”
পোচু আবেগে বলল, “এইটা বিপ্লব!”
কচু বলল, “এইটা যৌথ উদ্যোগ।”
জার্মানিতে বাংলা বিয়ে মানে বিশৃঙ্খলার শিল্পকলা: হল বুকিং, হালাল খাবার, বাংলা গান, জার্মান প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ ।
পোচু চেয়েছিল বিয়েতে “সামাজিক বক্তব্য” দিতে। কচু স্পনসর খুঁজছিল।
মচু শুধু বলছিল, “শান্তিতে অনুষ্ঠানটা করতে দাও।”
বিয়ের দিন, পোচু মাইকে বলল “প্রবাসে পরিবার গড়া এক ধরনের দেশপ্রেম।”
কচু বলল, “ভালো ফাইন্যান্স প্ল্যান ছাড়া বিয়ে কোরো না।” সবাই হেসে উঠল।
মচু আর তার সঙ্গী হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে শান্তি।

অবশেষে ....

কয়েক মাস পর পোচু দুই দেশে ভাগ হয়ে গেছে। দেশে কাজ করে, আবার জার্মানিতে ফিরে আসে। সে এখন কম চিৎকার করে, বেশি শোনে।
কচু নতুন করে শুরু করেছে। ছোট ব্যবসা। ধীরে। সতর্কভাবে।
মচু সংসার করছে। কিন্তু সাপোর্ট গ্রুপ চালু রেখেছে। এখন তার পাশে আরেকজন আছে।
একদিন আমরা আবার দেখা করলাম, মচুর সঙ্গীসহ।
পোচু বলল, “আমি বুঝছি, দেশ মানে শুধু ভৌগোলিক না। মানুষও দেশ।”
কচু বলল, “টাকা দরকার। কিন্তু সবকিছু না।”
মচু বলল, “একসাথে থাকাই সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা।”
আমি দূর থেকে ভাবছিলাম প্রবাসে জীবন মানে মাঝে মাঝে ফিরে যাওয়ার টান, মাঝে মাঝে হারানোর কষ্ট, মাঝে মাঝে নতুন পরিবার গড়ার সাহস ।
পোচু শিখিয়েছে, শিকড় ভুলে যেও না। কচু শিখিয়েছে, ভিত মজবুত করো। মচু শিখিয়েছে, মানুষ ধরে রাখো। তারা এখনও ঝগড়া করে। এখনও তর্ক করে। এখনও একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তারা জানে, একজন না থাকলে গল্প অসম্পূর্ণ।
ইউরোপে থাকা সহজ না। এখানে নিঃসঙ্গতা আছে। চাপ আছে। পরিচয়ের দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু যদি একটু পোচুর আগুন, একটু কচুর হিসাব, একটু মচুর হৃদয় থাকে তাহলে প্রবাস শুধু টিকে থাকা না, হয়ে ওঠে গল্প। আর আমরা সবাই হয়তো সেই গল্পের চরিত্র।

আমি ও আমার বাংলাদেশ

তৌহিদ আমানুল্লাহ – স্থাপত্য'৯১

আমি ও আমার বাংলাদেশ,
আমরা নিজের অস্তিত্বকে জানান দিয়েছি ১৯৭১-এ।
আমাদের পথচলা, আমাদের বেড়ে ওঠা
একই ইতিহাসের স্রোতে।

আমার বাংলাদেশ,
শীতের সকালের মিষ্টি রোদ,
আমার বাংলাদেশ,
মায়ের অকৃত্রিম আনন্দের মতো নির্মল।
৭ই সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধে কালে,
ধরণীর বুকে প্রথম আমি
বাবা আমাকে প্রথম দেখেন, ৫ মাস পরে,
স্বাধীন বাংলাদেশে।
তাই তিনি আজীবন,
প্রহরীর মতো -দাঁড়িয়ে দুয়ারে,আলোর নিশান।

আমার বাংলাদেশ,
জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ঊর্ধ্বে,এক স্বপ্নের বন্ধনে ।
যার গাঁথুনি রচিত হয়েছিল ,১৯৫২
আমি ও আমার বাংলাদেশ,
জানা-অজানার গভীরতায়,
কে যেন আজও ডাকে, নীরবে -নিভৃতে,
কখনও হৃদয়ে কাঁদি,কোন এক গহীনে,
আবার ছলছল জলে,ভরে ওঠে নয়নকোণে।

রক্ত -মাংসের লোভে,
লোলুপ ছারপোকা থেকে হায়েনা,
আর শকুনের ছোবল থেকে বাঁচতে,
সংগ্রামের পোশাক, আজও পরি,
সময়ের পর,সময় পেরিয়ে।
তবু আজও অধরা রয়ে গেছে
অর্থনৈতিক মুক্তি,
আইনের শাসন,
পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের স্বপ্ন।

আমিও পার হয়েছি,
শৈশব, কৈশোর ও যৌবন,
এখন পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে দেখি!
চারিদিকে কান্না আর রক্তে রাঙানো,
আমার ভাই-বোনের উৎকণ্ঠা।
হবে কি! শোষনের বলয় থেকে মুক্তি?
কবে উঠবে!সেই স্বাধীন মুক্ত সূর্য ?
কখন নবান্নের উৎসবে,
মেতে থাকবে আমাদের বাংলাদেশ?
প্রতিজ্ঞার প্রহর গুনে,
চলেছি আজও,
আমি ও আমার বাংলাদেশ।

স্রোতের সাথে চলা জীবন

আহম্মেদ বিন আব্দুস সালাম, এসডব্লিউই'১৪

আমার বেড়ে ওঠা একদম ডানপিটে, প্রানোচ্ছল, উন্মুক্ত গ্রামীণ ছেলে হিসেবে। সে এমন এক জীবন, যেখানে তীব্র ক্ষুধায় টের পেতাম এখন খাওয়ার সময় হয়েছে আমার। ততক্ষণে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যেত কোনো কোনোদিন। রান্নাঘরে যা রাখা থাকত তাই নাকেমুখে কটা খেয়ে নিতাম। কখনো মা, কখনো বোনেরা খাবার বেড়ে দিত। খেয়ে আবার ভোঁদৌড়। মানে যে খেলাটা রেখে আসতাম, তা আবার খেলতে যাওয়ার ছিল বড্ড তাড়া। ভীষণ মনে পড়ে সেই রঙিন দিনগুলো। সে যে কত রকমের খেলা ছিল আমার ছোটবেলায়। দিয়াশলাইয়ের বাক্স দিয়ে তাস খেলা, মার্বেল খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, আমচু বাগচু, ফুতিপেন্টি, পাক্কা, ঘোড়াদৌড়, ডাল ভাত খিচুড়ি আরও কত কী। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় খেলাধুলা ছিল আমার ফুল টাইম, আর পড়াশোনা ছিল পার্ট টাইম, তাও আবার পরিবারের গুরুজনদের চাপে বা কিছুটা খেয়ালে।

ওহ, হ্যাঁ, ভুলে গেছি, যেটা না বললেই নয়। ছোটবেলায় আমি কখন যে সাঁতার শিখেছি ঠিক মনে পড়ে না। সাঁতার শেখা আয়োজন করে হয়নি আমার। বুক পানিতে সাঁতার শেখার চেষ্টা করতে করতে পানি খেতে খেতে আমার সাঁতার শেখা। কেন বললাম সাঁতারের কথা? কারণ আমি মাটির ছেলে। কাদামাটির সোঁদা গন্ধ আর নদীর পানির কলকল ধ্বনি আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয়ের পাদদেশের দার্জিলিং জলপাইগুড়ি থেকে নেমে আসা ধরলা নদীর তীরের সখ্যতায় এই আমার বেড়ে ওঠা। কখনো কখনো বর্ষাকালে ভরা নদী সাঁতরে পার হয়ে যেতাম আমি। কতদিন এমন গেছে, দুপুরের গোসলটা নদীতেই সেরে ফেলেছি বন্ধুদের সাথে মারামারি বা প্রানোচ্ছলতায়।
সেই ছোটবেলা থেকেই প্রাইমারি স্কুলের সেই সংকল্প কবিতাটা আমার মনে দাগ কেটে গিয়েছিল

"থাকব না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার
জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের
ঘূর্ণিপাকে..."

এই প্রতিটি উচ্চারিত শব্দ আমি মনে প্রাণে ধারণ করতাম আর স্বপ্নে বিভোর হতাম। এভাবেই ধীরে ধীরে আমার মধ্যে একটা প্রগাঢ় উপলব্ধি তৈরি হয়, আমি বড় হয়ে দেশ হতে দেশ, দেশান্তরে ঘুরব। ঘুরবই।
এরপর টিক টিক টিক টিক, ঘড়ির কাটায় আর স্রোতের সাথে সাথে চলতে থাকল জীবন আর কটা সময়।

ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলাম আমি। আর আমার কিছু কিছু খেলাধুলার ধরন পরিবর্তিত হতে থাকল উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার সময়। ক্রিকেট কিংবা ফুটবলে মেতে থাকতাম

বেশিরভাগ সময়। বাড়ি থেকে হাঁটা পথের দূরত্বে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আমার ভালো লাগত না, কারণ আমার ছিল বিজ্ঞান এর প্রতি ঝোঁক। সাইন্স নিয়ে পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল আমার, কিন্তু গ্রামে ছিল না পর্যাপ্ত সুযোগ। তাই আমি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পরিবর্তন করে শহুরে স্কুলে ভর্তি হলাম।

নবম শ্রেণীতে পড়ি তখন। নবম শ্রেণীতে আসা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে মানুষটির সহায়তা আমার জীবনে ছিল, তিনি হলেন আমার বাবা। একান্নবর্তী পরিবার পরিচালনা করার গুরুদায়িত্ব তাঁর হাতে থাকলেও সবাইকে সমানভাবে শিক্ষিত করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। খুব দুরন্তপনা, অবাধ চলাফেরা আমাকে পড়াশোনা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল সে সময়। যা দেখে অনেকেই বুঝে নিয়েছিল টেনেটুনে ম্যাট্রিক পাশ করব হয়তো। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই আমার বাবা পরলোকগমন করেন। কান্নাকাটি করলাম অনেক, দিনজুড়ে, সপ্তাহজুড়ে, কিন্তু কোথায় যেন উন্মুক্ত মনে হলো নিজেকে । কারণ বাবার ছিল কড়া শাসন, যা ওই সময় ভালো লাগত না আমার। কিন্তু আসল বাস্তবতা আর বাবা না থাকার শূন্যতায় সৃষ্ট পরিবর্তন অনুভব করলাম মাস দুয়েক পর। আমার স্কুল মাঠে একটা জানাজার নামাজ পড়ছিলাম। হঠাৎ করে আমি বসে পড়লাম মাটিতে, অনুভব করলাম কী যেন একটা নেই আমার মাথার ওপর। এত প্রতিকূলতায় অনেকটা উন্মুক্ত, শাসনবিহীন থাকার পরেও আমি কখনো পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ হারাইনি।

আমরা দশ ভাইবোন। ছয় ভাইয়ের মধ্যে আমি সবার ছোট। বাবা হারানোর পর আমার পিতৃতুল্য বড় দুই ভাই পরিবারের দায়িত্ব বহন করেন, তারা আমাদেরকে বাবার অভাব বুঝতে দেননি। স্কুলের গণ্ডি পার করে আমি কলেজে উঠি, ঘোরাঘুরির পরিসর বাড়তে থাকে। গ্রাম ছেড়ে প্রথম বড় কোনো শহর রংপুরে থাকা শুরু করি। কলেজ শেষ করে রাজশাহীতে কোচিং করা শুরু করি, যেখানে আমার দেড় বছর থাকা হয়েছিল। তারপর সেই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ আসে, যা ছিল আমার জীবনের জন্য একটা মুক্তমঞ্চ। প্রচুর ঘোরাফেরা হতো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। প্রথম বর্ষ থেকেই ভ্রমণ, জীবনদর্শনের পূর্ণ অভিব্যক্তি, উচ্চতর শিক্ষায় পেশাদার ভবিষ্যৎ গড়ার নিমিত্তে বিদেশ, বিশেষ করে ইউরোপে আসার চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে তখন থেকেই দানা বাঁধতে থাকে আমার মধ্যে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর উচ্চতর শিক্ষার পথে নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করি। প্রস্তুতির সময়ের পাশাপাশি আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবেশ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করি। আমার খুব ইচ্ছা ছিল স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে আসব, তাই প্রতি বছর আমি ইউরোপে বিভিন্ন স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না থাকায় নিজ অর্থায়নে জার্মানির বন শহরে অবস্থিত বন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞান ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ২০২২ সালে ভর্তি হয়ে ইউরোপকে ঘিরে আমার স্বপ্নযাত্রার সূচনা হয়। যেহেতু জার্মানিতে আসার আগ পর্যন্ত আমি নিয়মিত বিভিন্ন স্কলারশিপের জন্য আবেদন করে গিয়েছিলাম। অবশেষে জার্মানিতে আসার পরই সেই কাঙ্ক্ষিত সুখবরটি পাই যে আমি ইরাসমাস মুন্ডুস স্কলারশিপ অর্জন করেছি। বন শহরে প্রায় তিন মাস অবস্থানের পর আমি দুই বছরের জন্য অধ্যয়ন থেকে বিরতি নিয়ে ইরাসমাস মুন্ডুস মাস্টার্স ইন সয়েল সায়েন্স প্রোগ্রামে যোগ দিই এবং প্রথম মোবিলিটি দেশ হিসেবে তুরস্কে যাত্রা করি।

এই স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামটি চারটি দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে পরিচালিত। তুরস্কের সামসুন শহরে অবস্থিত অন্দোকুজ মায়িস ইউনিভার্সিটি, পোল্যান্ডের ক্রাকো শহরের ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার ইন ক্রাকো, বুলগেরিয়ার এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি প্লভদিভ এবং জর্ডানের জর্ডান ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অধ্যয়নের ধারা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমি তুরস্কের অন্দোকুজ মায়িস ইউনিভার্সিটিকে নির্বাচন করি, যেখানে প্রথম সেমিস্টার বাধ্যতামূলক এবং যা সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী ধাপে আমি পোল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার ইন ক্রাকোতে অধ্যয়ন চালিয়ে যাই।

এই আন্তর্জাতিক শিক্ষাযাত্রা সম্পন্ন করার পর আমি পুনরায় জার্মানিতে ফিরে এসে পূর্বে শুরু করা স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামটি আবার চালু করি, যা এখনো চলমান। আশা করি খুব শীঘ্রই সেটি সম্পন্ন করতে পারব।

এই সমগ্র শিক্ষাজীবন আমাকে শুধু একাডেমিক জ্ঞানেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, মানুষ ও জীবনধারাকে কাছ থেকে জানার এক অনন্য সুযোগ করে দিয়েছে। পাশাপাশি ২০২২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পনেরোটি দেশ ভ্রমণ করেছি, যা আমার অন্তরের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি মানসিক পুষ্টিরও এক বিশেষ উৎস হয়ে উঠেছে।

শিক্ষার সাথে ভ্রমণ সম্পর্কিত আরও দুটি দেশের অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি ইরাসমাস

প্লাসের অধীনে একটি স্বল্পমেয়াদী মোবিলিটি কোর্স করেছি স্পেনের ইউনিভার্সিটি অব আলমেরিয়া থেকে 'ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাগ্রো কম্পানিজ' বিষয়ের ওপর, যেখানে আমি একটি গ্রান্ট অর্জন করি। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি ছিল পর্তুগালে 'ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ল্যান্ড ডিগ্রাডেশন' কোর্সের এক্সকার্শন।

কৃষ্ণ সাগরের তীরে: স্টুডেন্ট ডরম থেকে মাত্র দুই মিনিট হাঁটলেই বিশাল জলরাশির দেখা মিলত। মন খারাপ হলেই সেখানে গিয়ে বসতাম, কখনো কথা বলতাম নিজের সাথে, কখনো সেই সাগরের সাথে। আনন্দ হোক বা দুঃখ, প্রতিটি মুহূর্তের নীরব সাক্ষী ছিল সেই কৃষ্ণ সাগর। ক্যাম্পাসটি ছিল উঁচু পাহাড়ি টিলার ওপর। ডরম থেকে প্রতিদিন সাগরের তীর ঘেঁষে ফ্যাকাল্টিতে যেতে হতো। কখনো ক্লাস শেষে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসতাম। ধীরে ধীরে সমুদ্রটা আমার একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বাম পাশে রেখে হাঁটতাম, আর কত পথ যে আমরা সমান্তরালে চলেছি, তার হিসাব নেই। টার্কিশ খাবারগুলোও খুব উপভোগ করতাম। জার্মানি থেকে তুরস্কে আসার পর মাসে এক হাজার ইউরো স্কলারশিপ পেতাম। খরচ করার পরও মাস শেষে অর্ধেকের বেশি টাকা অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকত। শহরটা কিছুটা দূরবর্তী হওয়ায় বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি বলতে পারত না, কিন্তু তাদের আচরণে ছিল একধরনের আন্তরিকতা ও ভদ্রতা, যা ভাষার সীমাবদ্ধতাকেও ছাপিয়ে যেত। অল্প কিছু তুর্কি শব্দও শিখে ফেলেছিলাম। যেমন মেরহাবা মানে হ্যালো নে কাদার মানে দাম কত, নাসিলসিন বা নাসিলসিনিজ মানে কেমন আছো বা আছেন, গোরুশুরুজ মানে দেখা হবে, আর গুলে গুলে মানে বিদায়।

পুরো পাঁচ মাসের সময়টাতে আমি ভীষণ উপভোগ করেছি। সুযোগ পেলেই আমরা তুরস্কের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে বের হয়ে যেতাম। তার মধ্যে ভেজিরকোপ্রু, ইস্তানবুল, কাপাডোকিয়া, ত্রাবজোন এবং আঙ্কারা বিশেষভাবে মনে থাকার মতো।

ক্রাকোর দিনগুলো: ঐতিহাসিক দিক থেকে ক্রাকো পোল্যান্ডের অন্যতম প্রাচীন, রাজকীয় এবং ঐতিহ্যবাহী শহর। শুনেছিলাম, ওয়ারশ শহর নাকি আরও আধুনিক ও সুন্দর; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তার অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা হারিয়ে গেছে। সেই তুলনায় ক্রাকো আজও তার অতীতকে ধরে রেখেছে। কার্পাথিয়ান পর্বতমালার উপত্যকায় অবস্থিত এই শহরটি পোল্যান্ডের দক্ষিণে, স্লোভাকিয়া এবং চেক রিপাবলিকের খুব কাছাকাছি। ফলে এখান থেকে আশপাশের দেশগুলোতে ভ্রমণ করা বেশ সহজ ছিল। শহরের পুরনো অংশে হাঁটতে হাঁটতে মনে হতো, যেন ইতিহাসের ভেতর দিয়ে হাঁটছি। বিশেষ করে পুরনো ইহুদি কলোনিগুলো দর্শনার্থীদের জন্য অন্যতম আকর্ষণ, যেগুলো না দেখলে ক্রাকো ভ্রমণ যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমি ক্রাকোতে প্রায় একুশ মাস কাটিয়েছি। এই সময়ে শহরটার

সাথে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এখানকার কিছু খাবার, যেমন পিয়েরোগি, আমার খুব পছন্দের হয়ে ওঠে। তাছাড়া কেবাবের ব্যাপক প্রচলন এবং সাশ্রয়ী দাম হওয়ায় প্রায়ই খাওয়া হতো।

ক্রাকোকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলব সিটি অব নাইট, সিটি অব এনজয়মেন্ট, আর সিটি অব ট্যুরিস্টস হিসেবে। রাত নামার সাথে সাথে শহরটা যেন অন্য এক রূপ ধারণ করত। আলো, মানুষ, আর এক ধরনের প্রাণচাঞ্চল্য শহরটাকে আলাদা করে তুলত। পোলিশ ভাষা পৃথিবীর অন্যতম কঠিন ভাষাগুলোর একটি। ভাষাটা শেখার চেষ্টা করলেও জার্মানিতে ফিরে আসার পরিকল্পনা থাকায় খুব বেশি এগোনো হয়নি। তবে একটি শব্দ বেশ মজার লেগেছিল, Dzień dobry। তারা ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে দিনের বিভিন্ন সময়ে এটি ব্যবহার করে, যেখানে আমরা আলাদা করে শুভ সকাল, শুভ সন্ধ্যা বলি। সব মিলিয়ে, ক্রাকো শহরটি আমার কাছে শুধু একটি শহর নয়; এটি ছিল সময়, ইতিহাস এবং নিজের ভেতরের কিছু পরিবর্তনের নীরব সাক্ষী।

এছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘোরার সুযোগ হয়েছে আমার, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, অস্ট্রিয়া, চেক রিপাবলিক, স্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, আর বর্তমানে জার্মানিতে আমার অবস্থান। প্রতিটি দেশ আমাকে নতুনভাবে শিখিয়েছে মানুষকে বুঝতে, সংস্কৃতিকে দেখতে, আর নিজের অবস্থানটা নতুন করে ভাবতে। কোথাও পাহাড়, কোথাও সমুদ্র, কোথাও ইতিহাস, কোথাও আধুনিকতা, সব মিলিয়ে বুঝেছি পৃথিবীটা আসলে কত বৈচিত্র্যময়, আর সেই বৈচিত্র্যের মাঝেই মানুষের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আজ যখন পিছনে তাকাই, তখন সেই গ্রাম, সেই ধরলা নদীর তীর, সেই ডানপিটে ছেলেটার দৌড়ঝাঁপ, সবকিছু মিলেই আজকের আমাকে তৈরি করেছে। যে স্বপ্নটা ছোটবেলায় “থাকব না কো বদ্ধ ঘরে” বলে মনে গেঁথে গিয়েছিল, সেটাই আমাকে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে এসেছে। পথ এখনো শেষ হয়নি, বরং এই যাত্রাই আমাকে প্রতিনিয়ত নতুন করে গড়ছে। আমি এখনও সেই পথেই আছি, দেখছি, শিখছি, আর নিজের মতো করে পৃথিবীটাকে বোঝার চেষ্টা করছি।

আমি বিশ্বাস করি, মানুষ আসলে তার পথ চলার মাধ্যমেই তৈরি হয়, গন্তব্য দিয়ে নয়। প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি ভ্রমণ, প্রতিটি হারানো আর পাওয়া আমাকে একটু একটু করে বদলে দিয়েছে। আমি হয়তো এখনও খুঁজে চলেছি নিজেকে, কিন্তু এই খোঁজার মধ্যেই আমার বেঁচে থাকা, আমার যাত্রা।

পুনর্মিলনী সমাচার: ব্ল্যাক ফরেস্টে ঋটিকা রিইউনিয়ন

মোহাম্মাদ জামিল শুভ ও তাসমিনা তাবাচ্ছুম (বিজিই-১৪)

রিইউনিয়ন মানেই হাসি, আড্ডা, গান আর অনেকদিন পর সবার সাথে দেখা হওয়া। আর আমাদের KUinEu এর রিইউনিয়ন মানে তো আরও বাড়তি আনন্দ। আমি আর আমার বউ মুমু (বিজিই '১৪) ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানির এই সবচেয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল

শহর ফ্রাইবুর্গে চলে এসেছিলাম আমার পিএইচডির সুবাদে। এখানে আসার পর থেকেই ভাবছিলাম এতো সুন্দর এরিয়া, সবাইকে নিয়ে এদিকে একটা বড়সড় পার্টি না করলে হচ্ছে না। হঠাৎ একদিন একটা মিটিংয়ের মাঝখানে শুভ দাদা (ইউআরপি '৯৪) কল দিয়ে বললেন, "আমরা সবাই ফ্রাইবুর্গ আসছি। সব কিছু রেডি করো, তোমার হাতে ঠিক দুই সপ্তাহ সময় আছে একটা রিইউনিয়ন আয়োজনের!" আর তৌহীদ ভাই (আরকি '৯১) নির্ভয় দিয়ে বললেন যা ভাল লাগে আয়োজন করো কেউ কিছু বললে আমাকে রেফার করে দিবা! এই শুনে আমাদের কে আর পায় কে…

এমন একটা খবরে প্রচণ্ড রোমাঞ্চিত হওয়ার পরক্ষণেই আমি আর মুমু অবশ্য কিছুটা ঘাবড়েও গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, শেষমেশ আমরা মাত্র দুজন মিলে এত বড় আয়োজন ঠিকঠাকভাবে করতে পারব তো? তবে সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে সকল ভাই ব্রাদার এসে হাজির! রাফসান (কেমিস্ট্রি '১৫), সৌরাজ দাদা (কেমিস্ট্রি '১২), অনন্যা আপু (ফিজিক্স '১৩), রনি (এসডব্লিউই '১৪), মাইকেল ভাই (ইউআরপি '১১) আর রিপন ভাইয়ের (ইসিই '১১) অকল্পনীয় সাহায্যে শেষ পর্যন্ত আমাদের আয়োজন পরিপূর্ণ হলো। শুরু হলো অনেক মানুষের একসাথে আড্ডার দারুণ এক প্রস্তুতি।

ফ্রাইবুর্গ নেমেই সবাই সোজা আমাদের বাসায় হ্যালো বলতে চলে এলো। আমাদের দুজনের

ছোট্ট বাসায় এত মানুষের সমাগমে তখন রীতিমতো দেশের বিয়ে বাড়ির আমেজ। আড্ডা, কার্ড খেলা, গান আর খাওয়াদাওয়া দিয়ে উৎসব শুরু হলো। এরপর অনেক রাত পর্যন্ত চলল পুরো শহর ঘুরে বেড়ানো।

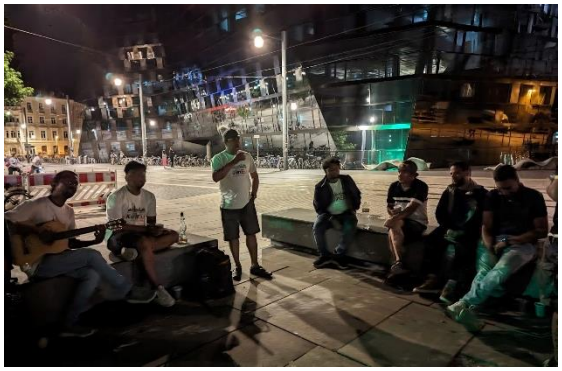

পরদিন সকালে বাস আর ট্রেন ভর্তি এক বিশাল দল নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সবার গায়ে KUinEu এর টিশার্ট। গন্তব্য সেন্ট্রাল ইউরোপের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ব্ল্যাক ফরেস্ট। প্রায় ছয় হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে থাকা এই সুবিশাল পাহাড়ি বনভূমি তার গভীর উপত্যকা, লেক আর ঘন পাইন গাছের জন্য বিখ্যাত। ন্যাচারাল সায়েন্সের প্রতি আগ্রহী হওয়ায় আমি আর মুমু সবাইকে নিয়ে এই বন, পাহাড় আর লেক ঘুরে বেড়াতে দারুণ উপভোগ করছিলাম। ঘুরতে ঘুরতেই ঘটল অনেক মজার মজার ঘটনা। লেকের পাড়ে সবাই মিলে বিভিন্ন গেম খেলা থেকে শুরু করে তৈরি হলো আরও অনেক অমূল্য মুহূর্ত।

এরপর একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়া শেষ করে সবাই মিলে আড্ডা দিতে দিতে আবার ফ্রাইবুর্গ শহরের সিটি সেন্টারে এসে বসলাম। রাতের সেই পরিবেশটা একেবারে আমাদের ক্যাম্পাসের হলের মাঠের মতো হয়ে গিয়েছিল। চললো পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ, খুনসুটি, গান আর নিরুদ্দেশ বকাবকি। প্রথমে চার পাঁচজনকে নিয়ে আড্ডা শুরু হলেও রাত বাড়ার সাথে সাথে ঘুরেফিরে সবাই এসে যোগ দিল সেই আসরে। আড্ডা ভাঙতে না চাইলেও পরের দিনের জন্য এনার্জি জমা রাখতে একসময় আমাদের ফিরতে হলো।

হালকা একটু ঘুম দিয়ে পরদিন সারাদিনের জন্য আমরা গেলাম ফ্রাইবুর্গ শহরের ভেতরের সুন্দর একটা পার্ক Seepark এ।

সেখানে ছিল ক্যাজুয়াল আড্ডা, বারবিকিউ আর বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন। বাচ্চারা খুব মজা পাচ্ছিল সব এনগেজিং গেমগুলোতে। অন্যদিকে বড়দের একটা অংশ ব্যস্ত বারবিকিউ করায়, কেউবা দেশি স্টাইলে ম্যাট বিছিয়ে বসে গেছে রিমার্কেবল '২৯' খেলতে। আরেকদিকে চলছে হৈহুল্লোড়, দেদারসে বাজনা আর ননস্টপ আড্ডা। এভাবেই হাসিখুশিতে আস্তে আস্তে দিনটা শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল আরও একটা সুন্দর রিইউনিয়ন।

হোস্ট হিসেবে মুমু আর আমি এতো চমৎকার আনন্দঘন মুহূর্ত গুলোর সাথে সবার সাইন করা একটা টিশার্ট উপহার পেলাম। তাতে লেখা ছিল 'বেস্ট হোস্ট এভার' এর কিছু একটা। এত সুন্দর সময়গুলোর স্মৃতি জড়ানো সেই টিশার্টটা এখনও খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

রিইউনিয়নে অংশ নেওয়া আর আয়োজন করার মধ্যে একটা বিশাল তফাত আছে। ফ্রাইবুর্গের এই জায়গাগুলো আমাদের জন্য এখনও ঠিক সেভাবেই আছে, কিন্তু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রিয় মানুষগুলোকে নিয়ে কাটানো সময়টা আমাদের জীবনের একটা বিশাল গল্প হয়ে গেছে। গত বছরগুলোতে এই জায়গাগুলোতে আরও অনেকবার গিয়েছি, অনেক নতুন মানুষের সাথে আড্ডা দিয়েছি। কিন্তু সবাইকে গিয়ে আমাদের এই রিইউনিয়নের গল্পটাই শোনাই বারবার। না চাইলেও ঘুরে ফিরে কিভাবে যেন সকল গল্প এসে আমাদের KUinEu এর রিইউনিয়নে গল্পে এসে মিলে যায়। একদম ঝটিকা এই আয়োজনটা জীবনের একটা কোর মেমোরি হয়ে স্টোর হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

ভালো থাকুক এই স্মৃতিগুলো, আর নতুন কোনো জায়গায় সবার সাথে আবার দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত চর্চায় থাকুক এই গল্পগুলোই।

উত্তরের উত্তরে: একটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনমেলার গল্প

আহম্মেদ বিন আব্দুস সালাম, এসডব্লিউই' ১৪

উত্তর গোলার্ধে বিচরণের স্বপ্ন বুনেছিলাম কলেজ জীবনের দিনগুলোতে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হিসেবে সেই স্বপ্নের প্রতি আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হয়ে ওঠে, এবং ধীরে ধীরে তার একটি বাস্তব রূপরেখা নির্মিত হতে থাকে। তবে সময়ের স্বাভাবিক গতিতে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কিছুটা সময় লেগেছে।

জুলাই, ২০২২। জার্মানির বন শহরে আগমন। ইউনিভার্সিটি অব বন-এ এগ্রিকালচারাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে মাস্টার্সে অধ্যয়ন শুরু করি। নতুন এই পশ্চিমা সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে নিতে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছিলাম; তবু কোথাও যেন এক অদৃশ্য শূন্যতা অনুভব করতে লাগলাম। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলে আসা দিন, মানুষ, স্মৃতি সবকিছুই বারবার ফিরে আসছিল মনে। বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে তখনই উপলব্ধি করি, আপনজনের উপস্থিতি কতটা অপরিহার্য।

এই সময়েই পরিচয় ঘটে ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উষ্ণ পরিমণ্ডলের সঙ্গে। জানতে পারি, ইউরোপে অবস্থানরত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি অরাজনৈতিক বন্ধন গড়ে উঠেছে, যেখানে সিনিয়র-জুনিয়র, সহপাঠী সকলেই একসূত্রে আবদ্ধ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বাতন্ত্র্য সত্যিই অনন্য যদিও সে আলোচনা অন্য কোনো সময়ের জন্য তোলা থাক।

জুলাই, ২০২৩। সামার ভ্যাকেশনের কারণে হাতে কিছুটা অবকাশ ছিল। সেই সময়েই সংবাদ পেলাম জার্মানির ফ্রাইবুর্গ শহরে খুলনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আয়োজনে ছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু মোহাম্মদ জামিল শুভ, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করেছিলাম; তবে তার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অন্য কোনো প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি রাখে।

জুলাই, ২০২৪। স্টকহোম। সুইডেনে অবস্থানরত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে তৃতীয় মিলনমেলা আয়োজিত হলো। দূরদেশে থেকেও এতগুলো পরিচিত মুখ, আপন মানুষ–সব মিলিয়ে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। মনে হলো, প্রবাসের ভেতরেই যেন নিজের এক ছোট্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে।

এই মিলনমেলায় এসে উপলব্ধি করলাম একটি আয়োজন তখনই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, যখন সকলের অংশগ্রহণ আন্তরিক হয়। ব্যাচেলর, বিবাহিত, সন্তান-সন্ততিসহ সবাই মিলে এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছিল, যেখানে তিন-চারটি দিন কখন যে ফুরিয়ে গেল, তা টেরই পাইনি। সময় যেন তার স্বাভাবিক গতি ভুলে গিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছিল। ঘোরাঘুরি, খেলাধুলা, আড্ডা, গান-বাজনা সব মিলিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল উচ্ছ্বাসময় ও আনন্দঘন।

তবে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের বেদনাও ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ায়। সময়ের পরিসমাপ্তি যেন সেই আনন্দময় মুহূর্তগুলোকে স্মৃতির ভাণ্ডারে স্থির করে দেয়।

আমার কাছে মনে হয়, প্রতিটি সূচনারই একটি উৎস থাকে, একটি শিখর থাকে। সেই শিকড় যেন “৯১০১০১” একটি পরিচয়ের প্রতীক, এক ধরনের বন্ধনের কেন্দ্রবিন্দু। তৌহিদ আমানুল্লাহ নামের সেই পরিচিত বড় ভাইয়ের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ভিন্নরকম আনন্দময়। তার উপস্থিতি যেন পুরো আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন রবিন ভাই, মিথুন ভাই, বৃষ্টি আপু, রিপন ভাই, অনন্যা আপুসহ আরও অনেকে। সবাই মিলে একসাথে কাটানো সময়গুলো আজও মনে পড়লে এক ধরনের উষ্ণতা অনুভব করি। বিশেষ করে রাতের আড্ডাগুলো যেন শেষ হতে চাইত না। সেই দীর্ঘ আড্ডায় পুরোনো দিনের স্মৃতি ফিরে আসত, গল্পের ভাঁজে ভাঁজে জেগে উঠত অতীতের অনুরণন। দিনের বেলায় সকালের নাস্তা শেষে সবাই মিলে ঘুরে বেড়াতাম স্টকহোমের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে।

আমি নিজে ছিলাম লেট-লতিফদের দলে সবসময়ই শেষ গ্রুপে। রাতজাগা আড্ডার

ক্লান্তি নিয়েই পরদিন আবার নতুন দিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হতো। তবু সেই ক্লান্তি আনন্দের কাছে হার মানত।

এভাবেই একে একে মিলনমেলার দিনগুলো পেরিয়ে গেল। কিন্তু কখন যে সময় ফুরিয়ে এলো, তা বোঝার সুযোগই হলো না। সবকিছু মিলিয়ে বলতে হয় এই মিলনমেলা ছিল এক পূর্ণাঙ্গ আনন্দের অভিজ্ঞতা, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল স্মরণীয়, প্রতিটি স্মৃতি ছিল হৃদয়ে গেঁথে থাকার মতো।

বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও এমন মিলনমেলা আমাদের জীবনে এনে দেয় এক অনন্য প্রশান্তি, আপনজনের সান্নিধ্যের উষ্ণতা। স্টকহোমের এই মিলনমেলাও তেমনি এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় যা সময়ের স্রোতেও মুছে যাওয়ার নয়।

শেকড়ের টানে

For the Roots

KUinEu

Khulna University Graduates in Europe